শরীরের গড়ন

অমিয়া গোস্বামী

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

বারাণসীর

বিখ্যাত চিকিৎসক

ডাঃ সুশীলরঞ্জন চৌধুরীর

শ্রীচরণকমলে—

ছোট বোন

অমিয়া

নিবেদন

যার প্রাণ আছে সেই প্রাণী। কত বিচিত্র প্রাণীতে ভরা এই পৃথিবী।

আজ থেকে ঠিক কত বছর আগে এবং ঠিক কি ভাবে পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব, তার সঠিক বিবরণ আজো মেলেনি। তবে একথা ঠিক, কোটি কোটি বছর আগে যখন পৃথিবী এখনকার মতো কোনো স্থায়ীরূপ গ্রহণ করেনি, তখন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জীবনের প্রথম সূত্রপাত। সেই আদিপ্রাণের নাম "প্রোটোপ্লাজম"। বৈচিত্র্যেভরা জীবজগতের উৎস এইখানেই, আর সেদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত হল জীবনের জয়যাত্রার আদিপর্ব।

কত যুগ চলে গেছে, সেই অতি ক্ষুদ্র পদার্থ প্রাণের প্রথম স্পন্দনটুকু বুকে নিয়ে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ধীরে ধীরে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হতে হতে কোন্ এক অজানা দিনে মানবরূপে দেখা দিয়েছে। সেই মানব দেহের গঠন-প্রণালীই এই গ্রন্থে আছে সহজ ও সরল ভাষায়।

যাদের জন্যে এখানি লেখা, তাদের সামান্য উপকার হয়েছে জানলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩৭২
(ইং ১৯৬৫)

অমিয়া গোস্বামী

এই লেখিকার—

সহজ ও সরল ভাষায়
ফল ও সব্জি সংরক্ষণের
অপূর্ব গ্রন্থ
রেখে খাও

শ্রীননীগোপাল গোস্বামীর লেখা—

* পঞ্চশিখা
* সবে মিলি করি কাজ (২য় সং)
* সাগর ছেঁচা
* মাটির গড়া এই ধরণী (২য় সং)
* ঠাকুরের কথা ও বাণী
* জীবে প্রেম করে যেই জন
* আমাদের উৎসব (২য় সং)
* শুক্তি সঞ্চয়
* সবার পরে গেল যারা
* সেই পথ
* বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ
* গাছপালা

শরীরের গড়ন

এক

অবতরণিকা

আমাদের শরীর ঢাকা চামড়া দিয়ে।

বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই ভিতরে কি চলছে। যখন সব ঠিক চলে, তখন আমরা ভুলে যাই আমাদের শরীর বলে একটা কিছু আছে। যখন নড়চড় হয় তখন মনে পড়ে আমাদের শরীরের কথা, মনে পড়ে আমাদের হাসি-কান্নার কথা, সুখ-দুঃখের কথা। তখন জানতে মন চায় কি করে অসুখ হল, কেন হল, কি করলে ভাল হবে, কতদিনে ভাল হবে।

অনেক দিন ধরে অনেক পরখ করে মানুষের শরীরে কি আছে না আছে, তা জানা গেছে। সে-জন্যে অনেক জীব-জানোয়ারকে নিয়ে পরীক্ষা করতে হয়েছে। তাতে দেখা যায়, অনেক জীব-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের শরীরের বেশ মিল আছে। একটি গরিলা বা বন মানুষের শরীরে হাড় আছে দু'শ ছ'টি। মানুষের শরীরেও ঠিক সেই ক'টি হাড় আছে। তবে আকারে, মাপে, আর অন্য সব খুঁটিনাটিতে কিছু কিছু তফাত আছে। তাহলেও এদের উভয়ের শরীরে হাড়গোড় সাজানো আছে অনেকটা একই রকম ভাবে।

কেউ হয়তো মনে করতে পারে আমাদের শরীরে কি আছে না আছে জেনে লাভ কি ?

লাভ আছে নিশ্চয়ই !

একটা কারখানায় যেমন নানা রকম কল-কব্জা থাকে,
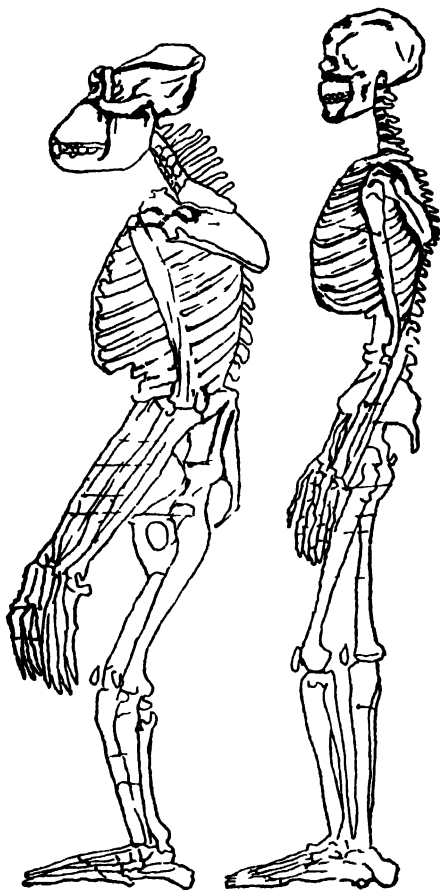
গরিলার হাড়   মানুষেব হাড়

যন্ত্রপাতি থাকে, বাইরে থেকে বোঝা না গেলে আমাদের শরীরের

ভিতরেও তেমনি অনেক রকম যন্ত্রপাতি আছে। একটা যন্ত্র কি করে চলে না জানলে যেমন তাকে ভালমতো চালানো যায় না, খারাপ হলে মেরামত করা যায় না, তেমনি আমাদের শরীর ভাল রাখতে হলে অনেক কিছু জানতে হয়।

কি খাওয়া উচিত, কি খাওয়া উচিত নয়, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এই সব বিষয় আরো ভাল করে বোঝা যায় যদি আমরা জানি শরীরের ভিতরে গিয়ে এই সব খাবার কি হয়, আর কোন্ কোন্ কাজে লাগে। শরীরের ভিতরের খবর জানা গেছে বলে আজকাল অসুখ হলে, কেন তা হল, কি করলে সারবে, কি করলে আর হবে না, সে সবই বোঝা গেছে।

মানুষের শরীরে একটা-দুটো নয়, ছোট-বড়ো মিলিয়ে অনেকগুলো আলাদা আলাদা কারখানা আছে। তাদের এক একটার কাজ এক এক রকম।

দুই
কঙ্কাল

মেরুদণ্ড

একটা কঙ্কালের ছবি দেখলে বোঝা যায়, আমাদের শরীরের মাঝখানে লম্বা গাঁট দেওয়া একটা হাড় রয়েছে। একে বলে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া। এইটেই আমাদের গোটা শরীরের খুঁটি।

আশ-পাশের সব হাড় তাকে ঘিরে রয়েছে। শরীরটা একেই নির্ভর করে গড়া।

মেরুদণ্ড

এই মেরুদণ্ডের সব সমেত তেত্রিশটি অংশ আছে। তার প্রথম চব্বিশটি খণ্ড জোড়া থাকলেও প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে স্পষ্ট দেখা যায়। ওপর থেকে শুরু করে প্রথম সাতটি গাঁট বা হাড় দিয়ে গলা, তার পরের বারোটি গাঁট দিয়ে আমাদের পিঠের খাঁচা, আর তার পরের পাঁচটি বড় গাঁট দিয়ে আমাদের কোমর তৈরি হয়েছে। তারই ঠিক নিচে পাঁচটি হাড়ের গাঁট জুড়ে গেছে আর তা দিয়ে হয়েছে আমাদের কোমরের নিচের অংশ। তারও নিচে রয়েছে চারটি জুড়ে যাওয়া হাড়ের টুকরো বা গাঁট, আমাদের যে সত্যি এককালে লেজ ছিল তার চিহ্ন হিসেবে।

এখানে যে ছবিটি রয়েছে, তাতে মেরুদণ্ডের হাড় কি ভাবে সাজানো আছে তা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

এই মেরুদণ্ড যাতে খুশিমতো বাঁকানো যায়, যাতে গাঁটে গাঁটে ঠোকাঠুকি না লাগে, হাড়ে হাড়ে চোট খেলে যাতে সে চোট সামলানো যায়, যাতে শরীর ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে, যাতে শরীরের ভার মাথা থেকে ধড়ে, ধড় থেকে কোমরে, কোমর থেকে পায়ে নেমে আসতে পারে, তাই এর প্রত্যেকটি জোড়া গাঁটের মাঝখানে এক রকম নরম জিনিসের গদি আছে। ইংরেজীতে একে বলে **কার্টিলেজ**, বাঙলায় একে **উপাস্থি** বলা হয়। কারণ এগুলো ঠিক হাড় নয়, হাড়ের মতো অথচ নরম, যেন আধা হাড়।

এই কার্টিলেজই শরীরের সমস্ত ভার বহন করে, মেরুদণ্ডকে এদিক-সেদিক বাঁকাতে সাহায্য করে। মানুষের বয়স যত বাড়ে তত এই নরম গদিগুলি ক্রমে শক্ত হয়ে আসে।

মেরুদণ্ডেব সব চেয়ে দরকারী কাজের কথা এখনো বলা হয়নি। আমাদের মাথা থেকে স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে পিঠের মাঝখান দিয়ে নেমে এসেছে। স্নায়ুমণ্ডলী কাকে বলে তা পরে বলা হবে। পিঠের স্নায়ুমণ্ডলীকে **মেরুমজ্জা** বলে, ইংরেজীতে বলে **স্পাইনাল কর্ড**। মেরুদণ্ডের শক্ত শক্ত হাড়ের একটা প্রধান কাজ হল নরম মেরু মজ্জাকে রক্ষা করা। মেরুমজ্জা মানে মেরুদণ্ডের ভিতরের শাঁস। সারা মেরুদণ্ডটি বেয়ে মাথার খুলি থেকে মেরুদণ্ডের শেষ পর্যন্ত, গাঁটগুলির ভিতর দিয়ে একটি সুন্দর নিরাপদ সুড়ঙ্গ নেমে গেছে। মাথা থেকে মেরুমজ্জা বা স্নায়ুমণ্ডলী এই সুড়ঙ্গ বেয়ে নেমে শরীরের চারদিকে চলে গেছে। এইভাবে মেরুদণ্ড মাথার সঙ্গে শরীরের অপরাপর অঙ্গের

যোগাযোগ রাখে, মেরুমজ্জাকে নিরাপদ রাখে, কারণ মেরুমজ্জা নিরাপদ না থাকলে শরীরের সাধারণ কাজটিও অচল হয়ে যায়। সাধারণ ভাবে বলা যায়, মেরুদণ্ডটি হল স্নায়ুমণ্ডলী থাকার পাকা বাড়ি।

মাথার হাড়

মুখ আর মাথার খুলি—এই নিয়ে তৈরি মাথার হাড়। নিচের চোয়ালের হাড় ছাড়া মাথার আর সবক'টি হাড় দেখলে মনে হয় যেন করাতের দাঁতের মতো খাঁজ খাঁজ করে কেটে তাদের বেশ মেপে মেপে একটার মধ্যে অন্যটিকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।
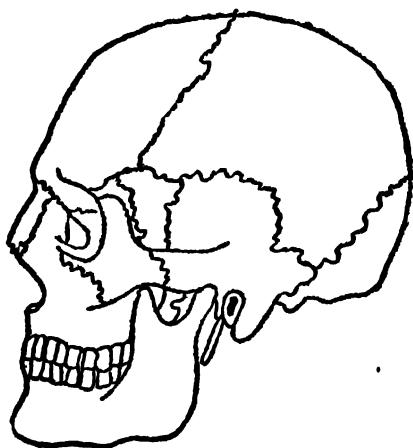
মুখ আর মাথার খুলি

ওপরের ছবি দেখে বোঝা যাবে কেমন দেখতে লাগে এই খাঁজে খাঁজে জোড়া লাগানো হাড়গুলোকে।

নিচের চোয়ালের হাড়টি এমন ভাবে মাথার খুলির সঙ্গে লাগানো, যাতে ইচ্ছে মতো ওপর-নিচে, আশ-পাশে, সামনে-পিছনে নাড়াচড়া করে খাবার চিবানো যায়।

বুকের খাঁচা

বারো জোড়া বাঁকানো হাড়কে এক সঙ্গে বলা হয় বুকের খাঁচা। এই বারো জোড়ার এক একটি হাড়কে বলা হয় **পাঁজরা,** ইংরেজীতে বলা হয় **রিব**। এই বারো জোড়া হাড়ের এক একজোড়া পিঠের মেরুদণ্ডের গাঁটগুলির সঙ্গে জোড়া, আর সামনে
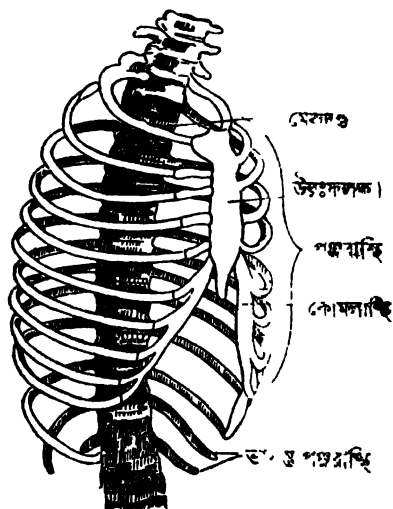
বুকের খাঁচা

বুকের একটা লম্বা হাড়ের সঙ্গে জোড়া। বুকের এই লম্বা হাড়কে বলা হয় **বক্ষাস্থি,** ইংরেজীতে **ষ্টার্নাম**। সব নিয়ে ঠিক

একটা খাঁচার মতো দেখায়। খাঁচার ভাল কথা 'পিঞ্জর'। তাই বুকের হাড়কে চলতি কথায় আমরা বলি **পাঁজর**। বারো জোড়া হাড়ের সব ক'টিই বুকের হাড়। তবে সব ক'টিই মেরুদণ্ডের গাঁটের সঙ্গে জোড়া নেই। নিচের দিকের শেষ দু'জোড়া পাঁজরও কোনো হাড়ের সঙ্গে জোড়া নেই। এরা পেশীর সঙ্গে গাঁথা। তাই এদের বলা হয় **ভাসা পাঁজরা**, আর ইংরেজীতে বলা হয় **ফ্লোটিংরিব**।

হাত আর পায়ের হাড়

আমাদের এক একটি হাতে সাতাশটি, আর পায়ে ছাব্বিশটি হাড় আছে। মোটামুটি বলা যায়, হাতের হাড় বা পায়ের হাড়, এদের প্রত্যেকেরই ওপরের ভাগ, মাঝখানের ভাগ আর শেষের ভাগ—এই তিনটি ভাগ আছে।

হাতের কব্জি আর পায়ের গোড়ালী বড় মজার জিনিস। কব্জিতে আছে আটটি হাড়, আর গোড়ালীতে সাতটি। হাতের তালু আর আঙুলের হাড়গুলো যেমন অদ্ভুত, পায়ের পাতার হাড়ও তেমনি। ধড়ের ওপরদিকে যেখানে আমাদের কাঁধ, সেখানে কতকগুলো হাড় ঠিক মালার মতো সাজানো থাকে। একে বলে **স্কন্ধ মালা**, ইংরেজীতে **শোল্ডার গার্ডল**। আমাদের হাত দু'টি এই স্কন্ধ মালার দু'পাশ থেকে বেরিয়েছে। যেখানে শরীরের সঙ্গে লেগেছে, ঠিক মনে হয় যেন একটি গোল বাটির মধ্যে মাপ করে লাগানো গোল মাথা। তেমনি ধড়ের তলার দিকে কোমরের নিচে দু'পাশে কতকগুলো হাড় মালার মতো গোল ক'রে সাজানো

থাকে। একে বলে **বস্তিমালা**, ইংরেজীতে **পেল্‌ভিক গার্ড্‌ল**। আর পা দু'খানি এই বস্তিমালার দু'পাশ থেকে বেরিয়েছে। যেখানে শরীরে সঙ্গে লেগেছে, সেখানে হাতের মতোই যেন গোল বাটি, আর তার মধ্যে গোল মুণ্ডের মতো মাপ ক'রে লাগানো জোড়।

মেরুদণ্ড, মাথার হাড়, বুকের খাঁচা, হাত আর পায়ের হাড়— এদের কথা হল, আমাদের শরীরের কাঠামোটি মোটামুটি কেমন দেখতে তা বোঝা গেল।

তিন

হাড় কি দিয়ে তৈরি

হাড়ের কথা মোটামুটি আমরা জেনেছি। চোখে দেখলে হাড়কে একটা শক্ত, সাদা রঙের জিনিস ছাড়া কিছুই বিশেষ মনে হয় না। তাই কি দিয়ে তৈরি হয়েছে এই হাড়গোড়, তা জানতে মন যায়।

হাড়ের প্রায় তিন ভাগের দু'ভাগ চুন। ইংরেজীতে **ক্যালসিয়াম** বলে এক রকম জিনিস আছে। তাই দিয়ে তৈরি আমাদের হাড়গোড়। সেইজন্যে ক্যালসিয়াম আছে এমন খাবার, যেমন ডাল, মাছ, ডিম, তরিতরকারি, দুধ অল্প বয়সে বেশি করে

না খেলে শরীরের বাড় ভাল হয় না। এই চুন বা ক্যালসিয়ামে হাড় শক্ত করে।

হাড়ের তিনভাগের দু' ভাগ ক্যালসিয়াম দিয়ে তৈরি হলে, বাকি থাকলো আর তিন ভাগের এক ভাগ। এই অংশটি **জেলাটিন** বলে একরকম নরম জিনিস দিয়ে তৈরি। এর জন্যে হাড়ের যে সামান্য বাঁকবার ক্ষমতা আছে, সেটা বজায় থাকে।

আগে উপাস্থি, আধাহাড় বা কার্টিলেজের কথা বলা হয়েছে। বেশির ভাগ হাড়ই যখন নতুন থাকে, তখন সেই **কার্টিলেজ** তৈরি হয়। যত বয়স বাড়ে হাড় তত পাকে ও শক্ত হতে থাকে। তাই ছোট ছেলেরা পড়ে গেলে তাদের নরম হাড় পুরোপুরি ভাঙে না, বড় জোর এক দিকটা একটু ফেটে যায়, কিংবা বেঁকে যায়।

হাড়ের মাঝখানটা এক রকম জিনিস দিয়ে তৈরি। তাকে বলে হাড়ের শাঁস বা অস্থিমজ্জা। হাড় শক্ত জিনিস হলে কি হবে, জ্যান্ত কোষ তার সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এখন কোষ কি, তা এইখানে একটু পরিষ্কার করে বলছি।

শরীরের সবচেয়ে ছোট জিনিসটির নাম **কোষ**। এব ইংরেজী নাম **সেল**। সেল বা কোষ কথাটি মৌমাছির চাকের কোষের কথা মনে করিয়ে দেয়। শরীরটা যেন মৌমাছির চাক —হাজার হাজার, কোটি কোটি কোষ বা সেল দিয়ে তৈরি। একটা শরীরে যে কত কোষ আছে, তা গুণে বলা যায় না, আর সব কোষ এক রকম আকারেরও হয় না, বিভিন্ন আকারের হয়।

এই কোষগুলি শরীরের শিরা-উপশিরাকে রক্ত সরবরাহ করে।

এক রকম সাদা, শক্ত সুতো বা দড়ির মতো ফিতে হাড়গুলোকে একটির সঙ্গে আর একটিকে বেঁধে জড়িয়ে রেখেছে।
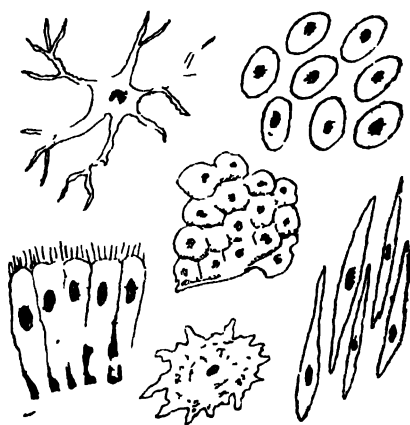
বিভিন্ন আকারের কোষ

এই ফিতেগুলোকে বলে **সন্ধিবন্ধনী**, আর এর ইংরেজী নাম **লিগামেণ্ট**।

দু'টো হাড় যেখানে মিশেছে বা মুখে মুখে লেগে আছে তাকে **সন্ধি** বলে। এই ফিতেগুলো বা সন্ধিবন্ধনী দিয়ে হাড়গুলো ঢাকা আর বাঁধা আছে। তাই খুশিমতো শরীরের হাড়গোড় নাড়াচাড়া করা যায়। খট করে যখন তখন হাড়ের গাঁট খুলে যায় না, হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি হয়ে চোটও লাগে না।

মানুষের শরীরে সন্ধি আছে দু'শ ত্রিশটি। সন্ধির কাজই

হল হাড়গোড়কে নড়াচড়া করতে সহায়তা করা। এই কাজের জন্যে এরা খুব কায়দা করে সাজানো থাকে। সন্ধিও আছে হরেক রকমের। কোথায়ও একটা হাড়ের ওপর আর একটা হাড় নড়ে-চড়ে বেড়ায়, কোথায়ও দু'টো হাড় খোলে আর বন্ধ হয়, কোথায়ও একটার চারদিকে আর একটা ঘোরে, কোথায়ও বা একটা হাড়ের শেষে একটা গোল বাটিমতো থাকে, এবং তারই কোটরে আর একটা হাড়ের গোল মাথা বেড়ায় নড়ে-চড়ে।

লিগামেণ্ট বা সন্ধিবন্ধনী দিয়ে সন্ধিগুলো এমনভাবে বাঁধা থাকে, আর তার ওপরে উপাস্থি বা কার্টিলেজ দিয়ে এমনভাবে মোড়া থাকে যাতে একটা হাড়ের সঙ্গে কখনো আর একটা হাড়ের ঘসা না লাগে। এ ছাড়াও প্রত্যেক সন্ধির চারধারে একটা বিশেষ ধরনের লিগামেণ্টের তৈরি থলি থাকে, যার ভিতরে একটা পাতলা পর্দা থাকে। সেই পর্দা থেকে এক রকম তেল বেরোয়। ইংরেজীতে একে বলে **সাইনোভিয়া**। হাড়ের শেষ দিকে কার্টিলেজ তৈরির জন্যে যে সব কোষ থাকে, সেগুলো ম'রে এই তেল হয়। যাদের গাঁটে গাঁটে বাতের ব্যথা, বুঝতে হবে তাদের শরীরে এই তেল তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, তাদের হাড়ের চারপাশের কার্টিলেজ হয় শুকিয়ে গেছে, নয় ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। তখন হাড়গোড়ের অবস্থা হয়—মরচে-পড়া মেশিনের মতো। তার মানে হল, এই তেল বা সাইনোভিয়া যেন কলকব্জার 'মোবিল'। 'মোবিল' না থাকলে যেমন গাড়ির

ভিতরে মরচে পড়ে, কল বন্ধ হয়ে যায়, সাইনোভিয়া না থাকলে হাড়েও যেন মরচে ধরে, ক্যাঁচ-কোচ করতে শুরু করে।

এখন হাড়ের সঙ্গে যে জিনিসটির খুব নিকট সম্পর্ক তার কথা জানতে হবে। একে বলে **পেশী** বা **মাংসপেশী**, যার ইংরেজী নাম **'মাস্‌ল'**।

চার
পেশী

আমাদের সব হাড় পেশী দিয়ে ঢাকা। তাহলে বুঝতে হবে, দেহের যেটাকে মাংস বলা হয় তার সবটাই পেশী। পেশীগুলো হাড়ের সঙ্গে আটকে থাকে। এতে রক্ত ও স্নায়ু দুই-ই আছে।

দু'রকমের পেশী আছে আমাদের শরীরে। এক রকম পেশী আছে যা আমরা ইচ্ছা করলেই চালাতে পারি। এ সব পেশী আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। তাই এদের বলা হয় **ঐচ্ছিক পেশী**, ইংরেজীতে **ভলাণ্টারি মাস্‌ল**। আর এক রকমের পেশী আছে যা আমাদের ইচ্ছার বশে নয়। এরা আমাদের আয়ত্তের একেবারে বাইরে। এদের নাম তাই **অনৈচ্ছিক পেশী**, ইংরেজীতে ইন্‌-ভলাণ্টারি মাস্‌ল।

হাত-পায়ের পেশী আমরা খুশিমতো নাড়াতে পারি। এগুলোর একটা দিক সচরাচর একটা দড়ার মতো জিনিস দিয়ে

হাড়ের সঙ্গে জোড়া থাকে। অন্যদিক, যে-হাড়টা সেই পেশীর সাহায্যে নড়বে তার সঙ্গে জোড়া থাকে, সেই একই রকম দড়ার মতো জিনিস দিয়ে। এই দড়ার মতো জিনিসটিকে ইংরেজীতে বলে **টেন্‌ডন**। কোনো ভারী জিনিস তোলার দরকার হলে হাতের পেশীর ওপর চাপ পড়ে পেশীটা কুঁচকে ফুলে যায়। তখন টেন্‌ডন নামে সেই দড়ায় টান পড়ে, আর হাতের হাড় কাজ করতে শুরু করে।

কোনো পেশী কখনো একা কাজ করে না। যে হাড়টাকে নড়ানো হল, সেটাকে আবার আগের জায়গায় ফিবিয়ে আনার জন্যে আর একটা পেশীর দরকার হয, যেটা তার উলটো দিকে কাজ করবে। সুতরাং যে কোনো পেশীরই উলটো মুখে আর একটা পেশী থাকবেই। এক ধরনেব পেশী কোনো অঙ্গকে কুঁচকে দেয, তার উলটো ধরনের পেশী কোনো অঙ্গকে আবার সোজা বা টান করে দেয়। মানুষ যে দাঁড়িয়ে থাকে বা বসে, হাঁটে, শোয়, তার জন্যে অনেকগুলো মাস্‌লকে এক সঙ্গে কাজ করতে হয়।

বসে হক, দাঁড়িয়ে হক, শুয়ে হক—যেভাবেই হক না কেন, মানুষ তার মেরুদণ্ডের সঙ্গে লাগানো সব ক’টি পেশী ব্যবহার করে।

মানুষের শরীরে সবসমেত পাঁচশ’র বেশি পেশী আছে। এই পেশীগুলো নানা আকারেব। সবগুলোর ওজন মানুষের সারা শরীরের ওজনের সাত ভাগের তিন ভাগ। দেখা গেছে,

শুধু একটি পা ফেলতে একজন লোককে তার শরীরের একশ' আটটি পেশী কাজে লাগাতে হয়। একটি পা ফেলতে গেলে কোন্ পেশীর পর কোন্ পেশী কুঁচকে যায় বা টান হয়, সে অনেক কথা। সব বলতে গেলে একখানা বড় বই লিখতে হয়।

নিচে একটা ছবি দেওয়া হল। এতে পিঠের পেশী কেমন ভাবে সাজানো থাকে, তার একটা আভাস পাওয়া যাবে ঃ
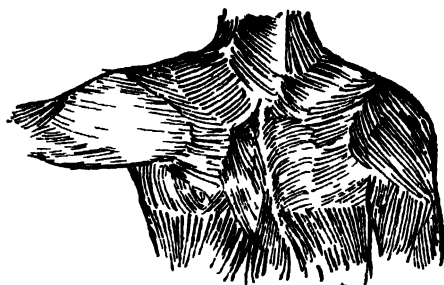
পিঠের পেশী

কেউ রাগলে ভুরু কুঁচকোয়, হাসলে কারো কারো গালে টোল পড়ে। কেন এমন হয়? না—আমাদের মুখে ছোট-বড়ো অনেকগুলো পেশী আছে বলে। তা না হলে আমাদের মুখ এক একটা মুখোসের মতো দেখাতো, মুখে কোনো ভাবই খেলতো না।

শুধু ভাব খেলাবার জন্যে যে আমাদের মুখে পেশী আছে, তা নয়। মুখের দু'টি বড় কাজ—খাওয়া আর কথা বলা। দু'জোড়া পেশী আছে, যেগুলো না থাকলে মানুষ খাবার চিবোতে পারতো না, কথা বলতে পারতো না। তার মধ্যে একজোড়া

পেশী গাল থেকে নিচের চোয়ালে লাগানো। এই দু'টি পেশী যখন কুঁচকোয় তখন নিচের চোয়ালকে টেনে তোলে। তাদের উলটো একজোড়া পেশী চোয়ালকে টেনে নামিয়ে রাখে, মুখটা খুলে যায়। এই দু'জোড়া পেশী একের পরে এক কাজ করে ব'লে মুখ খোলে, বন্ধ হয়।

খুশিমতো যেসব অঙ্গ নড়ানো-চড়ানো যায় তাদের পেশীগুলো সবই এই রকম একটা কুঁচকোয়, আর একটা টান ধরে। বুক, পিঠ, হাত, পা, ঘাড়—এই সব অঙ্গ নাড়াতে গেলেই দু'ধরনের পেশী কাজ করে।
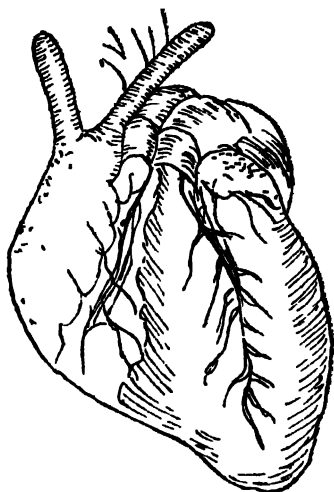
হৃৎপিণ্ড

এই সব পেশী আলাদা আলাদা থাকে। শরীরের কয়েক জায়গায় আবার এক ধরনের পাতলা, একের ওপর আর এক

করে পাতের মতো পেশী সাজানো থাকে। এই রকমের পেশী দেখতে পাওয়া যায় তলপেটের সুমুখের দেওয়ালে।

যে সব পেশী আমাদের ইচ্ছার বশে তার সবগুলোই দেখতে ডোরাকাটা। ডোরাকাটা দেখলেই বুঝতে হবে এগুলো খুশি মতো কোঁচকানো যায় বা টান করা যায়।

যে সব পেশী আমাদের ইচ্ছার বশে নয়, সেগুলো সাধারণত ডোরাকাটা হয় না। এই ধরনের পেশী থাকে সাধারণত আমাদের শিরা-উপশিরার চারদিকে। এই সব পেশীকে আমরা থামাতেও পারি না, চালাতেও পারি না। আপনা থেকেই এরা কাজ করে যায়। যেমন, আমাদের হৃৎপিণ্ড। এটি পেশী ছাড়া কিছু নয়। একে আমরা থামাতেও পারি না, চালাতেও পারি না। আপন মনেই এ তার কাজ করে যায়।

পাঁচ

পরিপাক প্রণালী

শরীরে দু'টো জিনিস দরকার।

একটা হল, কাজ করার ক্ষমতা। আর একটা হল, কাজ করতে শরীরে যে ক্ষয় হয় তার পূরণ।

এই জন্যে খাবার দরকার। খাবার শরীর গরম রাখে, ক্ষয় পূরণ করে, শরীরকে নতুন ক'রে গড়ে তাকে কাজ করবার উপযোগী করে তোলে।

দেহ সরাসরি খাদ্য কাজে লাগাতে পারে না। আমাদের দেহে কোটি কোটি জীবন্ত দেহকোষ আছে। প্রত্যেক কোষের নিজস্ব খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য পেটের মধ্যে গিয়ে এমনভাবে বদলে যায়, যাতে দেহকোষ তার সারাংশ সহজে শোষণ করে নিতে পারে। এইভাবে খাদ্যকে দেহের গ্রহণ-উপযোগী করে তোলার নাম পরিপাক বা হজম করা।

প্রথম ধাপ

দাঁত দিয়ে খাবার চিবানো হল হজমের প্রথম ধাপ। খাবারগুলো ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে চিবানো দরকার।

এর কারণ কি ?

কারণ আর কিছুই নয়, খাবারগুলোকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে লালার সাহায্যে ভিজিয়ে নরম করা। খাবার চিবানোর সময় মুখ থেকে এই লালা বেরোয়। তাতে খাবার নরম করে দেয়, যাতে সহজে গেলা যায়।

গ্রন্থি বা **গ্ল্যাণ্ড** বলে এক রকম ছোট বিচির মতো থলে থেকে এই লালা বেরোয়। কানের পিছনে, চিবুকের নিচে, আর জিভের তলায় তিন জোড়া এই গ্ল্যাণ্ড আছে, যা খাবার নরম করার জন্যে এই লালা বের করে। দিনে আধ সের থেকে এক সের পর্যন্ত এই লালা বেরোয়।

এর মধ্যে একটা বিশেষ গুণ আছে। সেজন্যে হজম করা কঠিন এমন খাবারও হজম হয়ে যায়। আমরা ভাত খাই, আলুও খাই। পরীক্ষায় জানা যায়, এ সবের মধ্যে **শ্বেতসার** বা **ষ্টার্চ**

বলে এক রকম জিনিস আছে। যে কয়টি জিনিস না হলে আমাদের শরীর ঠিক চলে না, তার মধ্যে শ্বেতসার একটি। এই শ্বেতসারকে চিনির মতো একটা জিনিস না করে নিলে, আমাদের শরীর তা গ্রহণ করতে পারে না। লালার মধ্যে যে বিশেষ গুণটির কথা বলা হয়েছে, তাই দিয়ে এই চিনি তৈরির কাজ কিছুটা হয়। লালায় **টায়ালিন** নামে এক রকম জারক রস থাকে। এই টায়ালিন শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে চিনিতে পরিণত করে। এই বিশেষ ধরনের চিনির নাম **ম্যাল্‌টোস** জাতীয় চিনি।

আগেই বলেছি, মুখে আছে তিন জোড়া রসবাহী গ্রন্থি, যা থেকে লালা বেরোয়। এই গ্রন্থি তিনটির নাম এবং কোথায় কি ভাবে আছে, সে কথা আরো একটু বেশি করে বলছি। গ্রন্থি তিনটির নাম—প্যারটিড, সাব্-ম্যাক্‌জিলারি, আর সাব্-লিঙ্গুয়াল।

লালগ্রন্থির মধ্যে প্যারটিড-গ্রন্থিই প্রধান। কানের নিচে দু' পাশে দু'টি থাকে। পড়বার বা কথা বলবার সময় এই গ্রন্থি থেকে লালা বেরোয়। তাতে কথা বলা সহজ হয়।

সাব্-ম্যাকজিলারি, আর সাব্-লিঙ্গুয়াল লালা-গ্রন্থি থাকে নিচের চোয়ালের দুই পাশে, আর জিভের তলায়। এ থেকে যে লালা বেরোয়, তাই হজমের সাহায্য করে।

দ্বিতীয় ধাপ

জিভের পিছনে, ঠিক তার তলা দিয়ে দুটো নল গেছে। তার একটি দিয়ে হাওয়া ঢোকে, আর একটি দিয়ে খাবার। যেটি দিয়ে হাওয়া ঢোকে, তার নাম শ্বাসনল বা **শ্বাসনালী**।

যেটি দিয়ে খাবার ঢোকে, তার নাম **গলনালী**। লম্বায় এটা প্রায়ই দশ ইঞ্চি। সেই দশ ইঞ্চি বয়ে গিয়ে খাবার যে নালী দিয়ে নামতে থাকে, তার নাম **অন্ননালী**। শ্বাসনালীর পিছন দিকে মুখের ভিতরের শেষ ভাগ থেকে অন্ননালী বরাবর নিচের দিকে নেমে গেছে। অন্ন-নালীর মুখ সব সময়েই বন্ধ থাকে। খাবার সময় এই মুখ যায় খুলে। প্রমাণ মানুষের শরীরে পুরো অন্ন-নালীটি প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা। গলনালী এই অন্ননালীরই প্রথম অংশটুকু মাত্র।

মজার কথা এই যে, গলনালীটিব তলায় শ্বাসনালীটি থাকে। আমরা নিশ্বাস নিই নাক দিয়ে, আর নাক হল আমাদের মুখের ওপরে। তবুও নিশ্বাস নামবার সময়ে মুখের ভিতরের পিছনের গহ্বরটা পেরিয়ে গলনালীর তলায় শ্বাসনালীতে ঢোকে। খাবার যাতে গলনালীতে যেতে গিয়ে শ্বাসনালীতে না চলে যায়, সে-জন্যে খুব চমৎকার ব্যবস্থা আছে।

নিচে একটি ছবি দেওয়া হল। এ থেকে বোঝা যাবে, কোথা দিয়ে খাবার যায়, আর কোথা দিয়ে হাওয়া ঢোকে। দুটো নালী ওপর-নিচে পাশাপাশি রয়েছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, নিচের শ্বাসনালীর ওপরে ছোট একটা ঢাকনা রয়েছে। এর ইংরেজী নাম—**এপিগ্লটিস**। ছবিতে এই শ্বাসনালীর ঢাকনাটি বন্ধ রয়েছে। এক এক গ্রাস খাবার গেলা হয়ে যায়, আর এই ঢাকনাটিও খুলে যায় নিশ্বাস নেবার জন্যে।

ছোট ঢাকনাটি ঠিক একটা বাক্সের ঢাকনার কাজ করে।

খাল থেকে জল তোলার পাম্প অথবা টিউবওয়েলের পাম্পের যেটাকে **ভাল্‌ভ** বলে, তা অনেকেরই দেখা আছে। শ্বাসনালীর এই ঢাকনাটি ঐ রকমের ভালভের কাজ করে। যখন খোলে তখন হাওয়া ঢোকে, যখন বন্ধ হয়, তখন গলনালী দিয়ে খাবার

গলনালী ও শ্বাসনালী

ঢোকে। যদি কখনো ভুল হয়, খাবার গলনালীতে না গিয়ে শ্বাসনালীর ওপর এসে পড়ে, আমরা **বিষম** খাই।

তৃতীয় ধাপ

খাবার মুখে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তা দাঁত দিয়ে পেষা হয়ে চূর্ণবিচূর্ণিত হয়। একে বলে চিবানো, ইংরেজীতে **ম্যাস্‌টিকেশন**। তার পর জিভ দিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়ার সময় তাতে লালা মিশে নরম হয়ে যায়। তখন গলার পেশী তাকে ঠেলে গলনালীতে

ঢোকায়। তারপর খাবার এসে ঢোকে আমাদের সারা পেট জুড়ে
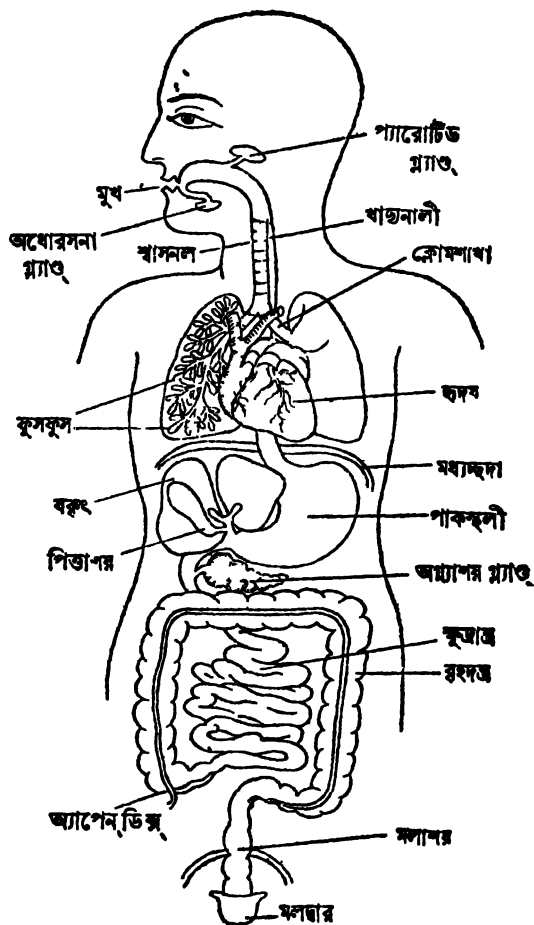
যে মস্ত লম্বা অন্ননালী আছে, তাতে একে বলে খাবারের খাল, ইংরেজীতে **অ্যালিমেনটারি ক্যানাল**।

একজন সাধারণ মানুষের শরীরে অন্ননালীটি লম্বা হবে প্রায় ত্রিশ ফুট। এটি কোথায়ও সরু, কোথায়ও মোটা, কোথায়ও প্যাঁচানো, কোথায়ও লম্বা হয়ে একেবারে মলাশয় (ইংরেজীতে রেক্‌টাম) পর্যন্ত গিয়েছে। এর প্রত্যেকটা অংশের আলাদা আলাদা নাম আছে। তাদের কাজও সকলের আলাদা-আলাদা। এসব খুঁটি-নাটি বিষয় অনেকের মনে রাখা কঠিন। কাজেই একটা আভাস দেওয়া যাচ্ছে—

গলনালী বুকের মাঝামাঝি দিয়ে নেমে, বুক আর পেটের মাঝখানের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ফুঁড়ে যখন শেষ হয়, তখন সেটা চওড়া হয়ে একটা থলির মতো হয়। এই থলিকে বলে **পাকস্থলী**, ইংরেজীতে **ষ্টমাক**।

অন্ন-নালীটিই মাঝপথে একটু বড় মতন থলে হয়ে গিয়ে পাকস্থলী হয়, আর এখানে খাবার গিয়ে পড়লে হজম হতে থাকে। এইখানেই হজমের তৃতীয় ধাপের শুরু।

পাকস্থলীর তলার দিকে আছে **ডুয়োডিনাম**। ডুয়োডিনামের ওপরে যকৃৎ, তার সঙ্গে পিত্তাশয় বা পিত্তের থলি, তার পর **অন্ত্র**। অন্ত্র যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে **সিকাম্**। সবশেষে আছে **রেকটাম** বা মলাশয়। ওপরের ছবিতে মোটামুটি সব দেখানো হয়েছে। আমাদের সকলের শরীরেই এ সব আছে, আর নিয়মিত নিজ-নিজ কাজ সমাধা করে যাচ্ছে।

পাকস্থলী যখন খালি থাকে, তখন চ্যাপ্‌টা হয়ে যায়। খাবার পড়লেই ফুলতে থাকে। আকারে এ খানিকটা নাশপাতি

বা লাউ-এর মতো দেখতে। মোটা দিকটা ওপরে, সরু দিকটা নিচে বাঁ দিকে চলে গেছে। থলিটি মাংসপেশী দিয়ে তৈরি, আর তলপেটের দেওয়ালের সঙ্গে সরু-সরু পর্দা দিয়ে আটকানো।

পাকস্থলীর গা চারটে স্তর দিয়ে তৈরি, একেবারে ভিতরকার স্তরটি একটি ন্যালনেলে আস্তর দিয়ে তৈরি। তাতে ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। তারা পাকস্থলীব ভিতবটাকে ভিজে রাখে, আর খাবার পেটে এলে এক রকম পাচকরস বা জারক-বস বার করে। এই রস দিয়ে হজমের কাজ চলতে থাকে। এই পাচকরসে **পেপ্‌সিন, রেনিন,** আর **হাইড্রো ক্লোরিক অ্যাসিড** বলে তিনটি জিনিস থাকে। একজন সুস্থ লোকের পেট থেকে বোজ প্রায দু' গ্যালন অর্থাৎ প্রায় সাড়ে আট সের পরিমাণ এই পাচক-রস বেরোয়। পাকস্থলীতে খাবার এসে পৌঁছলে তবে এই পাচক-বস বেরোয়। খাবারের সঙ্গে যদি কোনো দূষিত জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ কবে, তাহলে এই পাচকবসে মিশে তা মারা যায়।

হজমের এই তৃতীয় ধাপে এসে খাবারের চেহারাও যায় বদলে। পেটে শ্বেতসার, প্রোটিন, চর্বি বা ঘি ইত্যাদি পাঁচ-মিশেল খাবার পড়ার দু' ঘণ্টা বাদে যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহলে কতকগুলো জিনিস দেখা যাবে। দেখা যাবে চিনি হয়ে গেছে, এমন কিছু শ্বেতসাব আছে। কিছু তখনও চিনি হয় নি, এমনও আছে। গলে মিশে গিয়েছে, অথচ পরিপাক হয়নি, এমন কিছু

চর্বি আছে। আর সব কিছুর সঙ্গে মিশে আছে পাচক-রস। সবটা জড়িয়ে এই আধ-হজম খাবারকে একটা থক্‌থকে, ঘোলাটে সাদা, হড়হড়ে জিনিসের মতো দেখাবে। এর ইংরেজী নাম কাইম।

খাবারকে কাইম করে ফেলতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। বেশি কড়া তেলের ভাজাভুজি খেলে তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। আবার সিদ্ধ খাবার মাত্র ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কাইম হয়ে যায়। সেই জন্যে যত পারা যায় সিদ্ধ, অল্প-ভাজা খাবার খাওয়া উচিত। মশলাওয়ালা কড়াভাজা খাবার খুবই অপকার করে। কেন না তাতে পাকস্থলীর বেশি খাটুনি পড়ে।

খাবার যখন কাইম হতে থাকে তখন পেটের ভিতরকার পেশীগুলো সব সময় কাজ করে চলে। পাচক-রস খাবারদাবারকে ঠিকমতো তৈরি করছে কি-না, সেই দিকে তারা নজর রাখে। পাকস্থলীর পেশীগুলো থলির ভিতরকার খাবারকে কেবল ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে, যাতে খাবারের প্রত্যেক অংশে পাচক-রস পৌঁছতে পারে, পৌঁছিয়ে হজম করাতে পারে।

আমাদের পেটের আকার সব সময় বদলাচ্ছে। খালি থাকলে তাতে এক পোয়ার বেশি ধরে না, আবার বাড়তে আরম্ভ করলে তাতে খুব বেশি চার সের পর্যন্ত ধরানো যায়। তবে হরদম একে বেশি বাড়ানো উচিত নয়, অর্থাৎ, প্রাণপণে পেট ভরে খাওয়া উচিত নয়। তাতে বয়স হলে পেশীগুলো আলগা হয়ে যায়, পাকস্থলীর শক্তি কমে যায়। তাই বেশি বয়সে

হজমের গোলযোগ হয়। পেটুকরা প্রায়ই তাই বেশি বয়স হলে হজমের গোলমালে কষ্ট পায়। একটা কথা আছে, পেটেব চারকোণ ভরিয়ে খাবে না। কথাটা খুব ঠিক। আবার যদি হামেশা অল্প খাওয়া যায়, তাতেও খারাপ। তাতে পাকস্থলীব পেশীগুলো ঠিক মতো খাবাবকে টিপে টিপে ঘুরপাক খাওযাতে পারে না। ফলে, পাচক-রস ঠিক মতো বেরোয না, শরীব শুকিযে যায। কাজেই, খাবাব পরিমাপ মতো খাওয়া উচিত, বেশিও না, কমও না।

চতুর্থ ধাপ

পাকস্থলীর কাজের শেষে হজমের চতুর্থ ধাপের কাজ শুরু হয়।

আমাদের অন্ননালীটি একটা পেঁচানো সরু নালী। এই সরু নালী কিছু দূর গিয়ে বড় নালী হয। এই বড় নালীব প্রথমটির নাম ক্ষুদ্র অন্ত্র, পরেরটির নাম বৃহৎ অন্ত্র।

পাকস্থলী আর ক্ষুদ্র অন্ত্রের মাঝখানে একটা ছোট পথ আছে। সেখানে একটা গোল আকাবের পেশী দাঁড়িযে থেকে পাহারাওয়ালার কাজ করে। খাবার যখন ধীরে ধীরে হজম হতে থাকে, তখন এই পেশীটি ক্রমে খাবারকে ক্ষুদ্র অন্ত্রে যাবাব পথ ছেড়ে দেয়। পাকস্থলীতে হজমের কিছু সময়ের মধ্যেই সব খাবারটাই চলে যায় ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে। শুধু যে পেপ্‌টোন তৈরি হয়েছিল, তা এর সঙ্গে বেরিয়ে না গিয়ে পাকস্থলীর শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে।

এখন এই পেপ্‌টোন কি ভাবে তৈরি হয়, তাই এবার বলছি।

পাচক-রস দিয়ে আমাদের শরীরের পক্ষে খুব দরকারী, এমন আর একটা জিনিস হজম হয়। এরই নাম **আমিষজাতীয়** খাবার, ইংরেজীতে **প্রোটিন**। মাছ, মাংস, ডিম এ সবের মধ্যে প্রোটিন আছে। পাচক-রসের মধ্যে যে টক জিনিসটি আছে, তাই দিয়ে এই প্রোটিনকে গুঁড়ো করে, পিষে, নরম করে দেবার কাজ চলে। রেনিন বলে পাচক-রসে যে জিনিসটি আছে, তা দুধকে দই করে দেয়, পেটে ছানা করে। দুধের প্রোটিন এই ভাবে ছানা হলে তার ওপর পেপ্‌সিন কাজ করে। এই পেপ্‌সিন টক জাতীয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশে মাছ, মাংস, ডিমকে গলিয়ে থক্‌থকে একটা জিনিস তৈরি করে দেয়। প্রোটিন এমনিতে জলে গলে না, বা রক্তে সোজাসুজি যায় না। রক্তে যাতে মিশে যেতে পারে, তাই প্রোটিনকে এমনি ভাবে গলিয়ে **পেপ্‌টোন** নামে একটা আলাদা জিনিস তৈরি করতে হয়। যাদের পাচক-রসে টক জিনিসটি যথেষ্ট থাকে না, তাদের পেটে পেপটোন তৈরির কাজ তেমন ভাল বা যত তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত ততটা হয় না। তাদের পেটে ব্যথা আর অস্বস্তি হয়।

পেপ্‌টোন তৈরির কথা বলা হল। এইবার আবার আগের কথায় ফিরে যাই। ক্ষুদ্র অন্ত্র লম্বায় তেইশ ফুট। তার প্রায় সবটাই সাপের মতো কুঁচকে একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। কিন্তু তার প্রথম এক ফুট বাঁকা হলেও পেঁচানো নয়। এটা

আমাদের শরীরের একটা খুব দরকারী অঙ্গ। এরই ইংরেজী নাম **ডুওডিনাম**। এখানে দুটো বিশেষ বিশেষ রসের সাহায্যে যে খাবারটা এসেছিল তাব পুরোপুরি হজম হয়।

এই রস দুটো আসে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে।

প্রথমটার নাম পিত্ত, চলতি কথায় যাকে বলে পিত্তি। আমরা রাগী বা বদ্‌-মেজাজের লোককে বলি, "ওর পিত্তির ধাত আছে।" ইংরেজদেরও আগে হয়তো ধারণা ছিল, পিত্তের প্রকোপ থাকলে মানুষ নিষ্ঠুর বা রাগী হয়। সেই জন্যে যকৃতের সঙ্গে আটকানো যে পিত্তাশয় আছে, তাকে ইংরেজীতে বলে **গল ব্লাডার**, অর্থাৎ তেতো রাগের থলি। আর যকৃত থাকে পেটের ডান দিকে।

দ্বিতীয় রসটি ডুওডিনামের যেখান থেকে আসে, তার নাম **ক্লোম**, ইংরেজীতে বলে **প্যান্‌ক্রিয়াস**। এ থেকে যে রস আসে তার নাম ক্লোম রস। এই রস পিত্তনালীতে ঢুকে, পিত্তের সঙ্গে ডুওডিনামে যায়।

প্রোটিন, চর্বি প্রভৃতি গলাবার যে শেষ কাজটুকু থাকে, হজমের চতুর্থ ধাপে, তা এই পিত্তরস আর ক্লোমরসে মিলে করে। মানুষের শরীরে দিনে প্রায় পাঁচ পোয়া করে পিত্ত, পিত্তাশয় থেকে ডুওডিনামে এসে ঢোকে। এই পিত্ত ক্লোমরসে মিশে, পাকস্থলী থেকে বেরোনো হজম-না-হওয়া গলা চর্বিকে একেবারে তরল করে মিশিয়ে দেয়। পিত্ত আবার স্বাভাবিক জোলাপের কাজ ক'রে ক্ষুদ্র অন্ত্রের পেশীগুলোকে খাবারটা নিচের দিকে

ঠেলে দিতে সাহায্য করে। ক্লোমরস দিনে প্রায় তিন ছটাক করে ডুওডিনামে আসে। এর তিনটি কাজ। চর্বিকে গলিয়ে একেবারে তরল করা, পাকস্থলীতে যে সব প্রোটিন পেপ্‌টোন হওয়া বাকি ছিল তাদের পেপ্‌টোন করা, আর শ্বেতসারকে চিনিজাতীয় জিনিসে পরিণত করা, অর্থাৎ ঠিক যে রকমের চিনি রক্ত নিতে পারে তা তৈরি করা। এই দুই রসের এতগুলো কাজের ফলে, পেটের মধ্যে যে খাবার কাইম বলে একটা থকথকে পদার্থে দাঁড়িয়ে ছিল, তা এখন ডুওডিনামে এসে, চর্বিগুলো সম্পূর্ণ গলে গিয়ে পরিপাক হওয়ার দরুন, একেবারে দুধের মতো সাদা আর তরল হয়ে যায়। তখন আমাদের হজমের চতুর্থ পর্ব শেষ হয়।

পঞ্চম ধাপ

ক্ষুদ্র অন্ত্র দিয়ে এই তরল জিনিসটা কিছুটা পথ যেতে যেতেই, তার মধ্যে যেটুকু চিনি আর পেপ্‌টোন ছিল তা রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। শুধু চর্বি বাকি থাকে। এগুলো সোজাসুজি রক্তের সঙ্গে মিশে যায় না।

যেটুকু বাকি থাকে, তা ক্ষুদ্র অন্ত্রের তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত নেমে যেতে যেতে তা থেকে প্রায় সবখানি চিনি আর পেপ্‌টোন রক্তে চলে যায়। চর্বি তখনও অন্ত্রে থেকে যায়। তবে এই চিনি আর পেপ্‌টোনও সোজাসুজি রক্তের স্রোতে ঢোকে না। এরা প্রথমে ঢোকে **লসিকা প্রণালীতে**। ইংরেজীতে বলে **লিম্‌ফ্যাটিক** প্রণালী। গায়ের কোথাও কেটে গেলে লাল রক্ত

ছাড়াও এক এক রকম সাদা জলের মতো বেরোয়। তাকেই বলে লসিকা বা লিম্ফ। রক্ত যেখানে যায় না, এই লিম্ফ বা লসিকা সেখানে পৌঁছয়।

ষষ্ঠ ধাপ

ক্ষুদ্র অন্ত্রে যা বাকি থাকে তা গিয়ে ঢোকে বৃহৎ অন্ত্রে। বৃহৎ অন্ত্রের কাজ খাবারের জলীয় অংশটুকু শোষণ করে নেওয়া।

বৃহৎ অন্ত্রের প্রথম অংশটি একটি থলির মতো। ইংরেজীতে এর নাম **সিকম্**। এই সিকমের তলায় লেজের মতো একটা ছোট্ট জিনিস থাকে। একে বলে **উপাঙ্গ**, ইংরেজীতে **অ্যাপেন্ডিক্স**। খাবার হজমের সময় এটা একটা কৃমিপোকার মতো সব সময়ে নড়তে থাকে। এক কালে এর কোনো কাজ থেকে থাকলেও, এখন এর দরকার ফুরিয়েছে। অনেক সময়ে এখানে খাবার ঢুকে পড়লে অ্যাপেন্ডিক্স পচতে শুরু করে। তখন পেটে ব্যথা হয়, ডাক্তার অস্ত্র করে অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দিয়ে দেন।

সিকমের পরে যে অংশ থাকে, তাকে বলে **কোলন**। এর প্রধান কাজ হল খাবারের মধ্যে যদি কিছু ভাল জিনিস তখনও থেকে থাকে, তবে তাকে আর তার জলটুকু শুষে নেওয়া। যে জিনিসটা বাকি রইলো, তার মধ্যে আর কিছু সার পদার্থ নেই। তরকারি বা ফলের খোসা, বিচি, এমনি সব শক্ত জিনিস যা শরীর নিতে পারলো না, আর বিষাক্ত জিনিস যা পেটে

গিয়েছে কিন্তু শরীর নিলে তার ক্ষতি হত, তা ছাড়া শরীরের কাজে লাগার পর, কালো, পোড়া, কয়লার মতো যে সব জিনিস আর কাজে লাগে না, সেই সব তখন বৃহৎ অন্ত্রের শেষে এসে জমা হয়। তাকে যত শীঘ্র বের করে ফেলা যায় ততই ভাল। বড় অন্ত্রের শেষ অংশ, যার নাম **মলদ্বার**, তাই দিয়ে তা বেরিয়ে আসে।

এমনি করে হজমের ষষ্ঠ পর্ব বা শেষ ধাপ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের শরীরের ময়লা কি করে বেরিয়ে যায়, সে কথা কিন্তু এখনও শেস হয় নি।

ছয়

কি করে শরীরের ময়লা বেরোয়

আমাদের শরীর থেকে বিষ বের করে ফেলা খুবই দরকার। আমরা যে নিঃশ্বাস ফেলি, ঘামি, প্রস্রাব আর মলত্যাগ করি তার ভিতর দিয়ে এই বিষটুকু বেরিয়ে যায়।

যে সব জিনিসে আমাদের দরকার নেই, শরীর থেকে তা মলদ্বার দিয়ে বেরোয়।

সুস্থ থাকতে হলে শরীর থেকে কতকগুলো বিষ বেরোনো দরকার। এই বিষ বেরোয় চার ভাবে। ফুসফুস বের করে দেয় শরীরের বিষাক্ত গ্যাস, যার ইংরেজী নাম **কার্বন-ডাই-**

অক্সাইড। গায়ের চামড়া বের করে দেয় ইংরেজীতে যাকে বলে **ইউরিয়া**। কিড্‌নি বা মূত্র-যন্ত্রের সাহায্যে বেরোয় প্রস্রাবের মধ্যে দিয়ে বিষ। আর যকৃৎ (লিভার) ও কোলনের সাহায্যে বেরোয় মল।

অসুখ হলে ডাক্তার তাই চেষ্টা করেন শরীর থেকে যাতে মল বেরিয়ে যায়, আর প্রস্রাব ভাল হয়। কথায় বলে, 'ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো'। তার মানে আর কিছুই নয়, শরীরে যে বিষ থাকার ফলে অসুখ হয়েছিল, তা মল-মূত্র-ঘামের ভিতর দিয়ে বের করে দেওয়াই হল সুস্থ করবার একটা উপায়।

চামড়ার কথা

আমাদের সারা শরীর চামড়া দিয়ে ঢাকা। সে চামড়া অনেক ছোট ছোট ফুটোয় ভর্তি। এদের লোমকূপ বলে।

শরীরে যে বিষ আর ময়লা জমে, তার কিছুটা লোমকূপ দিয়ে ঘাম হয়ে বেরোয়।

শরীরের এই চামড়াখানির তুটি পর্দা আছে। পর্দা তু'টির একটির নাম **বহিরাবরণ**, ইংরেজী নাম **এপিডারমিস**। আর একটির নাম **ভিতরাবরণ**, ইংরেজী নাম **ডারমিস**।

অনেক সময় দেখা যায়, পোশাক-পরিচ্ছদের ঘটায় বা স্নানের সময় শরীর থেকে মরা মাসের মতো এক রকম শুকনো চামড়া ওঠে।

এগুলো আর কিছুই নয়, এপিডারমিসের দেহকোষগুলো যতই ওপরের দিকে উঠতে থাকে, ততই শুকিয়ে শুকনো চামড়া হয়ে উঠে যায়। দেখতে দেখতে সেই জায়গায় আবার নতুন কোষ

এসে ভরে যায়। এইভাবে শরীরের ভিতরে দেহ-কোষগুলোর ভাঙা-গড়া সব সময়ই চলতে থাকে।

শরীবেব চামড়ার গড়ন

মূত্রযন্ত্র
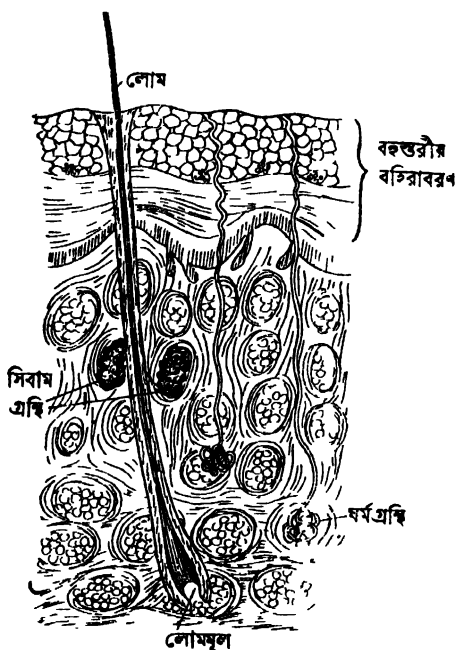
আমাদের তলপেটে মূত্রযন্ত্র থাকে। ইংরেজীতে বলে **কিড্‌নি**। সংখ্যায় এরা ছুটো। এক একটি দেখতে বড় বাদামের মতো, ওজনে প্রায় আধ পোয়া। তাদের বিশেষ কাজ হচ্ছে রক্ত থেকে ছেঁকে তার ময়লাটুকু বের করে দেওয়া। বিশেষ করে রক্তে যে প্রোটিন বা আমিষজাতীয় জিনিস আছে,

সেগুলো পুড়ে যে খারাপ জিনিস হয় তাদের বেব করে দেওয়াই কিড্‌নির কাজ।

কিড্‌নি দু'টির ছবি নিচে দেওয়া হল। তাদের ভিতরটা কেমন দেখাবার জন্যে বাঁ দিকের একটা কিড্‌নি চিরে তার আধখানা দেখানো হয়েছে।
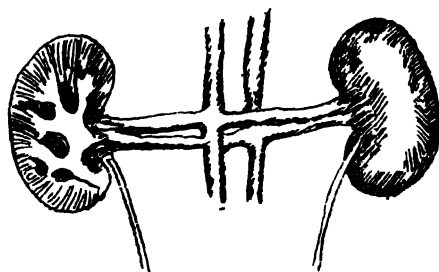
কিডনি

দিনে প্রায় সওযা সের জল এই দুই কিড্‌নিতে জমা হয়ে প্রস্রাব হয়ে বেরোয়। দুই কিড্‌নি থেকে সরু সরু দুটো নল বেরিয়েছে। এক একটি প্রায় পনেবো ইঞ্চি লম্বা। তাদের নাম **ইউরেটার**। ময়লা জল তাই দিয়ে **ব্লাডার** নামে একটা থলির মধ্যে জমা হয়। সেই ব্লাডাবেব অন্য মুখে একটি নল আছে, তার একটি পেশী আছে। তাব কাজ হচ্ছে মুখটি টিপে আটকে রাখা, যাতে জল যখন তখন না বেরোয়। সময় বুঝে আলগা হয়ে সে থেকে থেকে ময়লা জলটা বের করে দেয।

কিডনিব ভিতবের কোষগুলো একটা বিশেষ ধরনে সাজানো। সারা কিড্‌নিতে ছোট ছোট থলির মতো জিনিস থাকে। তাতে

এর একটি শিরা-উপশিরার মুখ থাকে। সেই শিরা-উপশিরার মুখ থেকে রক্তের ময়লা বেরিয়ে এসেও এই থলিতে জমা হয়।

যকৃৎ

যকৃতের আসল কাজ পিত্ত যোগাড় করা। তা ছাড়া আর একটি বড় কাজ আছে তার। সেটি হল **গ্লাইকোজেন** ব'লে একটা জিনিস জমা করা, যা থেকে চিনি বের হয়ে রক্তের সঙ্গে মেশে। এখানে শরীরের ইউরিয়া বলে ময়লাও জমা হয়। লিভার যখন একবার ঠিক করে ফেলে যে, কতকগুলো জিনিসকে কিছুতেই শরীরের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হবে না, তখন সেই ময়লাটুকু রক্তের ভিতর দিয়ে কিড্‌নিতে আসে। সেই ময়লা তখন মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

যকৃতকে তাই, ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এমন যন্ত্র বলা চলে। শরীরে যে সব গ্রন্থি আছে তার মধ্যে যকৃৎ সব চেয়ে বড়। একজন বয়স্ক লোকের যকৃতের ওজন প্রায় দেড় সের।

সাত

রক্ত চলাচল

শরীরে যে খাবারটা আসে, রক্তের কাজ হল তাকে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া। যাতে রক্ত শরীরের সব জায়গায় খাদ্য নিয়ে যেতে পারে, আর সেখানকার সব ময়লা সরিয়ে আনতে পারে, সেজন্যে বারবার নতুন রক্ত তৈরি হবার দরকার হয়। কারণ, রক্তই এই কাজের একমাত্র বাহন।

আগেই বলেছি, শরীরের সবচেয়ে ছোট জিনিসটির নাম কোষ। অনেকগুলো কোষ নিয়ে এক একটি তন্তু হয়। ইংরেজীতে বলে টিস্যু। ছোট, বড়ো, সরু, মোটা, এমন অনেক টিস্যু শরীরের চারদিকে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এই সব টিস্যু বা ছোট ছোট নলকে ইংরেজীতে বলে **ব্লাড ভেস্‌ল**। হৃৎপিণ্ড থেকে সব রক্ত এই জালে ছড়িয়ে পড়ে। যে সব নল দিয়ে রক্ত বাইরে যায়, তাদের বলে ধমনী। আবার এই হৃৎপিণ্ডেই সারা জাল থেকে রক্ত ফিরে আসে। যে সব নল দিয়ে রক্ত ফিরে আসে তাদের বলে শিরা-উপশিরা, ইংরেজীতে **ভেন্‌**।

আমাদের হৃৎপিণ্ড এই নলগুলোর ভিতর দিয়ে অনবরত পাঁচ সের রক্ত পাকা করে দিচ্ছে। আমাদের হৃৎপিণ্ড রয়েছে দু'টি ফুসফুসের মাঝখানে। এটি অদ্ভুত কতকগুলো পেশী দিয়ে তৈরি। আমাদের ঐচ্ছিক পেশী কাজ পড়লে সময়মতো ঠিক কাজ

করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় ধরে কাজ করালে এসব পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনৈচ্ছিক পেশীগুলো তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে না পড়লেও, আস্তে আস্তে কাজ করে। হৃৎপিণ্ড অনৈচ্ছিক পেশী দিয়ে তৈরি। এই পেশী সব সময় খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে, আর একজন সুস্থ মানুষের শরীরে কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। একজন বয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে সাধারণত সত্তরবার কুঁচ্‌কোয়।

হৃৎপিণ্ডের আকার একটা লোকের হাতের মুঠোর সমান। এর পেশী অল্প অল্প ডোরা কাটা। পুরু একটা থলির মতো জিনিস দিয়ে হৃৎপিণ্ডকে মুড়ে নিরাপদে রাখে একটি পর্দা। এই পর্দার ইংরেজী নাম **পেরিকার্ডিআম**।
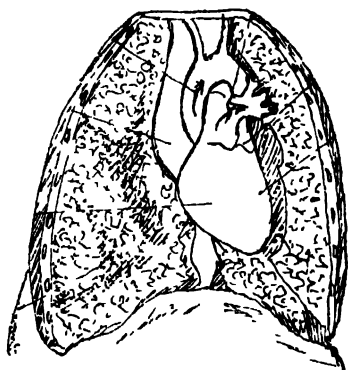
দুটো ফুসফুসের মাঝখানে হৃৎপিণ্ড

একটি ছবি দেওয়া হল। এতে দুটো ফুসফুসের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডকে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে যেন রক্ত চালানোর একটা পাম্প। এই পাম্পটির দু'টো ভাগ। এই দু'টি অংশ যেন দু'মহল বাড়ি।

প্রত্যেক বাড়িতে হু'টি তলা। এক একটি তলায় এক একটি ঘর। তার মানে, আলাদা আলাদা এই হু'টি মহলে, ওপরে হু'টি ঘর আর নিচে হু'টি ঘর। ওপরের ঘর হু'টিকে **অলিন্দ**, ইংরেজীতে **অরিকুল** বলে, আর নিচের হু'টিকে **নিলয়**, ইংরেজীতে **ভেন্ট্রিকুল** বলে।

ওপরের তলার ঘর আর নিচের তলার ঘরগুলো কিন্তু এক রকম নয়। ওপরের ঘর হু'টি, যার নাম অলিন্দ, তা ছোট, আর এব দেওযাল পাতলা। অলিন্দের চেয়ে নিলয় হু'টি দেখতে আরো বড়, আব তাদের গাযের দেওযাল আরো পুরু। প্রত্যেকে
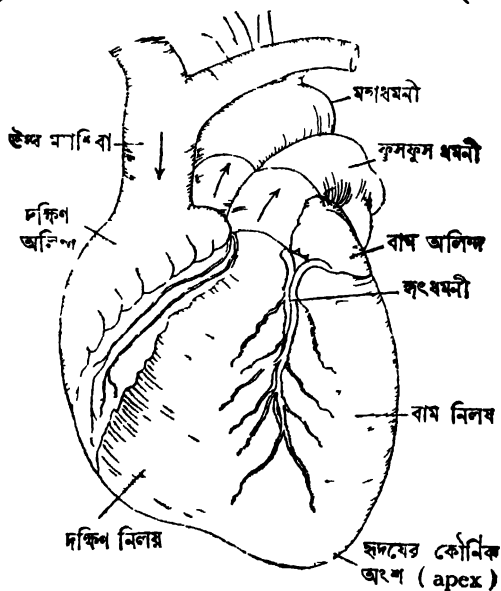
হৃৎপিণ্ডেব ভিতবেব দিক

অলিন্দের সঙ্গে তার নিজের নিলয়ের যোগাযোগ রাখার জন্যে

একটা ক'রে দরওয়াজা আছে, তাকে **ভাল্‌ভ** বলে। ওপর থেকে চাপ পড়লে সে দরওয়াজা দু'টি নিচের দিকে খুলে যায়। কিন্তু নিচে থেকে তাকে ওপর দিকে খুলবার উপায় নেই। রক্ত চলাচল যাতে একদিক দিয়ে হয়, চারদিক দিয়ে রক্ত ছুটোছুটি ক'রে যাতে একটা গণ্ডগোল না হয়, তার জন্যে এই ব্যবস্থা।

হৃৎপিণ্ড একবার কুঁচকোয় আবার ফুলে যায়, আবার কুঁচকোয় আবার ফুলে যায়। এটা সম্ভব হয় এর মাংসপেশীগুলোর কোঁচকানো আর টান হবার জন্যে। কোঁচকানো আর ফুলে যাওয়া দু'টি মিলে হৃৎপিণ্ডের কাজ একবার পূর্ণ হয়।

শুধু কুঁচকোয় আর ফুলে যায় বললে কিন্তু সব বোঝা গেল না। প্রথমে অলিন্দ দু'টি একসঙ্গে তাড়াতাড়ি, অল্প সময়ের জন্যে কুঁচকোয়। তার পর নিলয় দু'টি একসঙ্গে আর একটু বেশি সময় নিয়ে কুঁচকোয়। তার পর আসে একটা বিরাম। এই বিরামটুকু অলিন্দ দু'টি আর নিলয় দু'টি পরপর কুঁচকোতে যত সময় নেয় প্রায় ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে। তার পর আবার কোঁচকানো শুরু হয়।

অলিন্দ কুঁচকে রক্ত নিলয়ে আসে। নিলয় কোঁচকালেই নতুন এক ঝলক রক্ত ওপর দিকে যে একটা মোটা নল আছে, তার ভিতর দিয়ে সমস্ত রক্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এই নলটির নাম **মহা ধমনী**।

এই ধমনীটি শরীরের সবচেয়ে বড় আর মোটা ধমনী। এর চেয়ে ছোট ছোট ধমনীও শরীরের চারদিকে ছেয়ে রয়েছে, পরিষ্কার রক্ত নিয়ে যাবার জন্যে।

এই ধমনীগুলোর গা এমন মজবুতভাবে তৈরি, যে এরা সহজে অনেকখানি চাপ সহ্য করতে পারে। এদেব গা সহজে বাড়ে কমে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় এইসব ধমনীর চাপ সহ্য কববার শক্তি কমে যায়।

ধমনীগুলো শরীরের খুব গভীর জায়গায় থাকে, যাতে সহজে তাদের গায়ে ঘা না লাগে। ধমনী যদি কোনো রকমে ছিঁড়ে যায় তবে খুব বেশি রক্ত পড়তে থাকে, আর তা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়।

এই ধমনীগুলো সরু হতে হতে শরীরের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। সব চেয়ে ছোট যখন হয়, তাকে অনুধমনী বা ইংরেজীতে **ক্যাপিলারি** বলে। শরীরের ভিতরে-বাইরে সব জায়গায় এই ক্যাপিলারিব জাল ছেযে আছে। আর এই ক্যাপিলারির ভিতর দিয়েই শরীর হাওয়া আর তার নিজেব খাদ্য নেয় আর বের করে দেয়।

শরীরের প্রতি অঙ্গে পরিষ্কাব রক্ত নিয়ে যাবার পরে, হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসার জন্যে, সেই রক্ত অন্য কতকগুলো নলের মধ্যে জমা হতে থাকে। এই নলগুলো যে অপরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডে বয়ে আনে, তাকে ফুসফুসে পাঠিয়ে দেয় পরিষ্কাব করার জন্যে। এদের শিরা বলে। এই শিরাগুলো ধমনীর পাশে পাশেই চলে, তবে এরা শরীরের তত ভিতর দিকে থাকে না। এদের গায়ের দেওয়ালও তেমন পুরু নয়। এদের মধ্যে খানিকটা পর পর কপাট আছে, যাদের ইংরেজী নাম ভাল্ভ। এই কপাটগুলোই শরীরের রক্ত চলাচল পরিচালিত করে।

যখন এই কপাটগুলো আর ঠিকভাবে কাজ করে না, তখন আমাদের শরীরে নানান্ অসুখ দেখা দেয়।
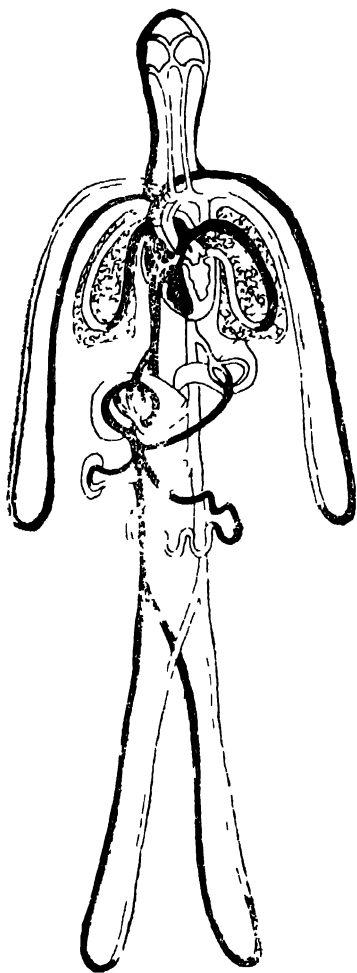
এই শিরাগুলোর মধ্যে দু'টি প্রধান শিরা আছে। একটি শরীরের ওপরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন হাত, মাথা ইত্যাদি থেকে রক্ত বয়ে আনে। একে বলে **উর্ধ্ব মহাশিরা**। আর অন্যটি তলার অঙ্গগুলোর রক্ত বয়ে আনে। একে বলে **নিম্ন মহাশিরা**। এই শিরা দু'টি তাদের সব রক্ত উজাড় করে দেয় হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে। সেই রক্ত ডান নিলয়ে যায়। ডান নিলয় হয়ে **ফুসফুস-ধমনী** বলে একটি নলে গিয়ে পড়ে। এই নলের আছে দুটি শাখা। তাই দিয়ে রক্ত ভাগ হয়ে দু'টি ফুসফুসে চলে যায়। সেখানে গিয়ে ছোট থেকে আরো ছোট হাজার হাজার

সারা শরীরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়

নলের মধ্যে সেই রক্ত নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে ফুসফুস দু'টি ঢেকে

ফেলে। সেখান থেকে পরিষ্কার হয়ে তারা আবার বড়ো, তার পর আর একটু বড়ো শিরা দিয়ে অবশেষে চারটি মোটা মোটা শিরা দিয়ে বয়ে এসে হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের অলিন্দে এসে হাজির হয়। এইভাবে হৃৎপিণ্ডের ডান দিকের অপরিষ্কার রক্ত ফুসফুসের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের মহলে গিয়ে পড়ে। সেখান থেকে পাম্প করে মহাধমনী বা আওর্টা ধমনী দিয়ে তাকে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যতবার নিলয় কুঁচকোয়, ততবার রক্ত যেন দমকা দিয়ে রওনা দেয় মহা ধমনীর দিকে। ধাক্কার চোটে মহাধমনী খুলে যায়। আর সেই ধাক্কা সব ধমনীতে ছড়িয়ে যায়। এই ধাক্কা তাই হৃৎপিণ্ডের কোঁচকানোর সঙ্গে তাল রেখে চলে। মিনিটে কবার এই ধাক্কা টের পাওয়া যাচ্ছে তা পরীক্ষা করাকে নাড়ী দেখা বা ইংরেজীতে পালস্ দেখা বলে।

আট

রক্ত কি ?

রক্ত একটা তরল পদার্থ। এর অনেকখানিই জল, প্রায় আশিভাগ। তবে এটা একেবারে নিছক জলীয় জিনিস নয়। ছোট ছোট অনেক শক্ত জিনিসও এতে আছে। তাদের বলে রক্ত কণিকা, ইংরেজীতে **ব্লাড কর্পাসূল**। এই কণিকা লাল হয়, সাদাও হয়। এরা রক্তের রসে ভেসে বেড়ায়। এই রক্ত-রসের নাম **প্লাজমা**। এই প্লাজমার কোনো রঙ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের রক্ত লাল আর সাদা কণিকায় ভর্তি। পনেরো ফোঁটা রক্তের মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি লাল কণিকা আর প্রায় এক লাখ সাদা কণিকা আছে।

লাল কণিকাগুলো খুব নরম, আকারে বাড়ে-কমে, আর সব চেয়ে সরু অনুশিরার ভিতর দিয়েও সহজে যেতে পারে। একটা কণিকা আর একটা কণিকার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। এই লাল কণিকা তৈরি হয় শরীরে যে-সব লম্বা হাড় আছে, তাদের লাল মজ্জায়। এরা রক্তের সব জায়গায় যাতায়াত করে।

রক্ত-রস বা প্লাজমা এক রকম নোন্‌তা জলীয় জিনিস। এর জাত সহজে বদলায় না। খুব খানিকটা নুন খেলেই যে রক্ত-রসে নুনের পরিমাণ বাড়বে, তা নয়। তবে বেশি রকম ঘাম হওয়ার ফলে শরীর থেকে যদি অনেকখানি নুন বেরিয়ে যায়,

তা পূরণ করা উচিত। সেই জন্যে গরম দেশের লোকে বেশি নুন খায়।

রোদে খুব খানিকটা খাটাখাটুনি করে তেতেপুড়ে এসে যদি ঢক-ঢক করে অনেকখানি জল খাওয়া যায়, তাহলে সর্দিগরমি হয়। এর কারণ, রোদে কাজ করলে ঘামের ভিতর দিয়ে শরীরের অনেকখানি নুন বেরিয়ে যায়। সেই সময় জল খেলে রক্তে জল বাড়ে, নুনের ভাগ যায় আরো কমে। কাজেই তখন জল খেলে শরীর বেসামাল হয়, সর্দিগরমি হয়। সেইজন্যে রোদে ঘুরে খুব ঘেমে এসে সঙ্গে সঙ্গেই জল খেতে নেই। যদি খেতেই হয়, মুখে একটু নুন ফেলে তবে জল খেতে হয়। তাতে সর্দিগরমি হয় না।

শরীরেব কোথায়ও কেটে গেলে রক্ত পড়ে। কিছু সময় পরেই তা শুকিয়ে যায়। দেহ থেকে রক্তপাত হলেই রক্তের তাবল্য নষ্ট হয়, আর তিন-চার মিনিটের মধ্যেই তা জমাট বেঁধে যায়। রক্তের মধ্যে একরকম জিনিস আছে। তার ইংরেজী নাম **ফাইব্রিনোজেন**। যাদের রক্তে এই জিনিসটি থাকে না, তাদের কোথায়ও কেটে গেলে রক্ত-পড়া বন্ধ হয় না। এটা এক রকম অসুখ। যার এরকম থাকে, তার পক্ষে ভয়ের কথা। সামান্য একটু কেটে গেলে রক্ত প’ড়ে এ থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

রক্তপাত হবার পর কি করে তা বন্ধ হয়, আর একটু পরিষ্কার করে বলছি।

আগেই বলেছি, রক্তপাত হলেই তার তারল্য নষ্ট হয় এবং কিছু সময়ের মধ্যে জমাট বেঁধে যায়। একে বলে **তঞ্চন**, ইংরেজীতে **কো-অ্যাগুলেশন**। পরে এ থেকে রক্তমণ্ড বেরোয়।

রক্তপাত হবার পর তঞ্চন বা রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া দুইটি **প্রতিক্রিয়া** দ্বারা সাধিত হয়। ইংরেজীতে এই প্রতিক্রিয়াকে বলে **রি-অ্যাকসন**। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় রক্ত **থ্রম্বিন**, আর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ায় **ফাইব্রিনে** পরিণত হয়।

প্রথম প্রতিক্রিয়া—শরীরে রক্তপাত হলে ক্ষত জায়গা থেকে **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** নামে এক রকম জিনিস বেরোয়। এই
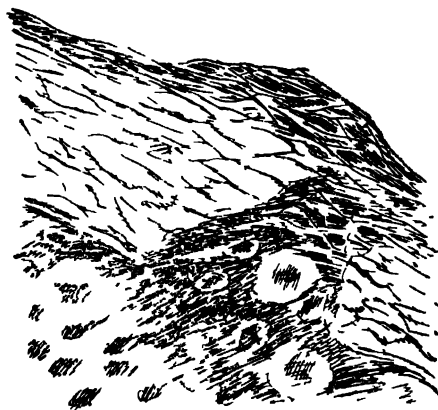
রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে

থ্রম্বোপ্লাস্টিন প্রতিক্রিয়া দ্বারা **প্রোথ্রম্বিন** ও **ক্যালসিয়মের** সহযোগে **থ্রম্বিনে** পরিণত হয়। যেমন,—থ্রম্বোপ্লাস্টিন + প্রোথ্রম্বিন + ক্যালসিয়াম = থ্রম্বিন।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া—রক্তের মধ্যে **ফাইব্রিনোজেন** নামক এক রকম পদার্থ ঐ থ্রম্বিনের প্রতিক্রিয়া দ্বারা জেলির মতো পদার্থে পরিণত হয়। এটি রক্তের কণিকার সঙ্গে জড়িত হয়ে জেলির আকার ধারণ ক'রে **ফাইব্রিনে** পরিণত করে। পরে এই কণিকাসহ ফাইব্রিন ক্রমে সঙ্কুচিত হয়, আর তা থেকে রক্তমণ্ড বেরিয়ে জমাট বাঁধে। যেমন,—

ফাইব্রিনোজেন + থ্রম্বিন = ফাইব্রিন।

ফাইব্রিন + রক্তকণিকা = জমাট (তঞ্চন)।

নিচে একটি ছবি দেওয়া হল। ফাইব্রিন রক্তকণিকা আটকে কি করে রক্তপড়া থামায়, তা দেখানো হচ্ছে—
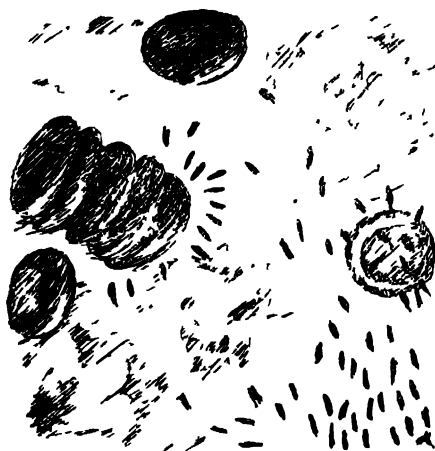
সাদা কণিকার সঙ্গে জীবাণুর যুদ্ধ

লাল কণিকা ছাড়াও শরীরে সাদা কণিকা আছে। এদের ইংরেজীতে **লিউকোসাইট** বলে। লাল কণিকার মতো দেখতে

এরা চ্যাপ্‌টা গোলগোল নয়। নিজেদের শরীর এরা সব সময়ই বদলাচ্ছে! এরা ভেঙ্গে দু'ভাগও হতে পারে। এদের সব চেয়ে বড়ো কাজ হল আমাদের শরীরে কোনো জীবাণু ঢুকলেই তাদের বাধা দেয়। এজন্যে মাঝে মাঝে এদের প্রাণও দিতে হয়। সাদা কণিকার মৃতদেহ তখন পুঁজ হয়ে বেরিয়ে আসে।

নিচের ছবিতে লাল কণিকা আর সাদা কণিকা দুই-ই দেখা যাচ্ছে। সাদা কণিকারা জীবাণুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের হয় হজম করছে, না হয় ধ্বংস করছে।

লাল কণিকার মধ্যে **হিমোগ্লোবিন** বলে এক রকম জিনিস থাকে বলেই রক্তের রঙ লাল। এর মধ্যে প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় একটি জিনিস থাকে। তার মধ্যে এক রকমের লোহাও থাকে। এই লোহাটুকু এমন অবস্থায় থাকে যাতে তা হাওয়ায় মিশতে পারে, আর তাকে নিয়ে রক্তে ঘুরে বেড়াতে পারে। যাদের রক্তে এই লোহার সঙ্গে মিশানো প্রোটিনের ভাগ অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনের ভাগ কমে যায়, তাদের রক্তশূন্যতা হয় আর ফ্যাকাসে দেখায়।

রক্ত চলাচলের সঙ্গে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজও জড়িয়ে আছে। বাতাসে **অক্‌সিজেন** বলে এক রকম জিনিস আছে। মানুষ এই অক্‌সিজেন না পেলে বাঁচতে পারে না। রক্তের লাল কণিকা বাতাস থেকে এই অক্‌সিজেন বয়ে নেয়। তখন সেই অক্‌সিজেন সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। ফলে যে জিনিসটা ময়লা তা পড়ে থাকে। এই ময়লার ইংরেজী নাম **কার্বন-ডাই-**

অক্‌সাইড। যে যন্ত্রের সাহায্যে অক্‌সিজেন গ্রহণ আর কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড ত্যাগ—এই কাজ চলতে থাকে, তাকেই বলে শ্বাস-প্রশ্বাস। এর জন্যে ফুসফুস বলে আমাদের একটি বিশেষ অঙ্গ আছে। এখানে এসে রক্ত পরিষ্কার হয়।

নয়

ফুসফুস

দুটো বড় তিনকোণা থলি হল আমাদের ফুসফুস। এর রবারের মতো বাড়ে-কমে।

ফুসফুস দু'টি আমাদের হৃৎপিণ্ডের দু'ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। ফুসফুসের ভিতরকার দেওয়ালগুলো এমন-ভাবে তৈরি যাতে যতখানি সম্ভব চারদিকে নিঃশ্বাসের হাওয়া খেলে। **প্লুরা** বলে এদের গায়ে, দুই পর্দার একটা পাতলা ঢাক্‌না আছে। এই দুই পর্দার মাঝখানে একটা জলজলে জিনিস থাকার দরুন নিঃশ্বাসের সময়ে ফুসফুসের এই ওঠা-নামার কাজটা ভাল চলে। এই জলজলে জিনিস আছে বলে দু'টো পর্দা অনায়াসে নড়েচড়ে, ঘসা লাগে না।

বাতাস যাতে ফুসফুসে যায় তার জন্যে কয়েকটি নলের মতো আছে। প্রথমে নাক থেকে জিভের পিছন দিয়ে নামে **শ্বাসনালী**। একে ইংরেজীতে বলে **ট্রকিয়**। এই শ্বাসনালী থেকে আবার দু'টি নালী দু'টি ফুসফুসে চলে গেছে। এদের **ব্রঙ্কাই** বলে। নাক,

শ্বাসনালী আর সব শেষে ব্রঙ্কাই দিয়ে এসে হাওয়া ফুসফুসের মধ্যে ঢোকে। শ্বাসনালী আর ব্রঙ্কাই-এর সমস্ত ভিতরের দেওয়ালটা সরু সরু লোমে ভর্তি। এই লোমগুলো নিঃশ্বাসে দোলে আর এদিক্-ওদিক নড়ে। তাতে নিঃশ্বাসের সময় ধুলোবালি যা কিছু আমাদের নাকে ঢোকে তা আটকে যায়, ফুসফুসে ঢুকতে পারে না।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ে গলনালীর সামনে যে দরওয়াজা, যাকে **এপিগ্লটিস্** বলে, তা হাট হয়ে খুলে যায়। তখন হাওয়া ঢোকে। নাকের মধ্যে দিয়ে ঢুকতে গিয়ে বাইরের হাওয়া একটু গরম হয়। সেই হাওয়া এপিগ্লটিসের মধ্যে দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালী বা ট্রকিয়তে যায়। ট্রকিয় থেকে যায় ব্রঙ্কাইতে। সেখান থেকে যায় ফুসফুসে, তার প্রতি থলিতে থলিতে, কোষে কোষে। ফুসফুসের এই কোষগুলোকে ইংরেজীতে বলে **এলভিওলাই**।

সাধারণত প্রতি চার সেকেণ্ড পর পর ফুসফুস বাতাস নিয়ে ফুলে ওঠে। যখন মানুষ পরিশ্রম করে, কি ব্যায়াম করে, তখন তার আরো বেশি অক্সিজেন দরকার হয়। তাই তাকে তখন আরো ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে হয়।

আমরা সব সময়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছি বলে ফুসফুসের হাওয়া অনবরত বেরোচ্ছে আর আসছে। রক্তের পক্ষে তাই সব সময় অক্সিজেন (অম্লজান) পাওয়া সম্ভবপর হয়। ফুসফুস রক্তকে অক্সিজেন দিয়ে তার কাছ থেকে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড (অঙ্গার অম্লজান) নিয়ে নেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তা বের করে দেয়। এমনিভাবে রক্ত চলাচল আর শ্বাস-প্রশ্বাস এক সঙ্গে কাজ করে।

দশ

স্নায়ু

আমাদের সারা শরীরে এক রকম সরু-মোটা হলদেটে সুতোর জাল বিছানো আছে। এদের **স্নায়ু** বলে। ইংরেজীতে বলে **নার্ভ**। মানুষের দেহে যা কিছু আছে সবগুলো একসঙ্গে চালানোর ভার হল স্নায়ুর। আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের নড়াচড়া এই স্নায়ুর নিয়ম মতো হয়। দেহের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে আছে এর বিশেষ যোগাযোগ।

আমাদের দেহে যে সব স্নায়ু আছে, সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যদিও দু'য়ের মধ্যে আছে নিবিড় সংযোগ।

প্রথম হল **কেন্দ্রীয় বা মধ্যবর্তী** স্নায়ু **প্রণালী**, যাকে ইংরেজীতে বলে **সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম**। এরা শরীরের একেবারে মাঝখানে রয়েছে। মস্তিস্ক আর মেরুমজ্জা থেকে যে সব স্নায়ু বেরিয়েছে তাদের নিয়ে হল এই কেন্দ্রীয় স্নায়ু প্রণালী। এই ভাগের স্নায়ুগুলো আমাদের চোখ, কান, নাক, জিভ, চামড়া —এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সব জায়গা, আর আমাদের ঐচ্ছিক পেশীর সব ক'টির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এদের নিয়ে হল স্নায়ুর এক ভাগ।

স্নায়ুর অন্য যে ভাগ আছে, তারা জোড়া-শিকলের মতো জোট বেঁধে মেরুমজ্জার দুই দিকে সারি বেঁধে রয়েছে। এরা খবর রাখে কেন্দ্রীয় স্নায়ুপ্রণালী কি করতে চাইছে, আর সেই

সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে কাজ করে। এমন সহানুভূতির সঙ্গে কাজ করে ব'লে ইংরেজীতে এর নাম **সিম্‌প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্‌টেম**। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমাদের শরীর যে নড়ে, বা যে সব কাজগুলো করে, তা এই দুই দল স্নায়ুর সাহায্যে করে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুর কাছে যে খবর বা চেতনা পৌঁছোয়, সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ু তা অনৈচ্ছিক পেশীর কাছে চালান দেয়। আমাদের হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, অন্ত্র,—এরকম অনেক জায়গায় অনেকগুলো অনৈচ্ছিক পেশী আছে। আমাদের শরীরে যদি শুধু কেন্দ্রীয় স্নায়ু থাকতো, তাহলে দরকারী খবর শুধু ঐচ্ছিক পেশীর কাছে পৌঁছতো। কিন্তু অনৈচ্ছিক পেশীর কাছেও খবর পৌঁছোবার দরকার আছে। এই কাজটা সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুর দল করে। তাই আমরা না ভাবলেও আমাদের শরীর কতকগুলো কাজ আপনা-আপনি করে যায়।

এগারো

মস্তিষ্ক

বুদ্ধি, বিদ্যা—সবই হয় আমাদের মস্তিষ্কের জোরে। সোজা কথায় আমরা একে ঘিলু বলি।
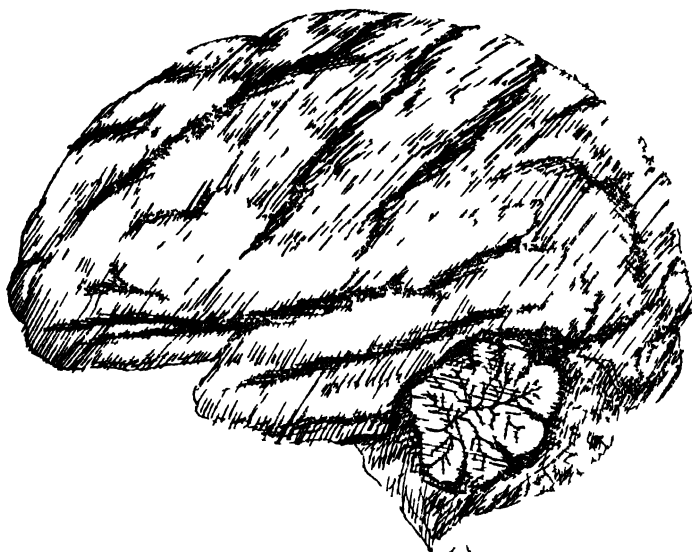
মস্তিষ্ক বা ঘিলু

এই মস্তিষ্ক স্নায়ুর সুতো আর স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরি এক রকম থল্‌থলে জিনিস। একজন বয়স্ক লোকের মাথায় এর ওজন প্রায় দেড় সের। মস্তিষ্কের মোটামুটি চারটে ভাগ—**সেরিব্রাম, সেরিবেলাম, পনস** আর **মেডালা অবলঙ্গাটা**। ছবিতে একটা

বড় ফুলকপির মতো মস্তিষ্কের সবচেয়ে যে বড় অংশটি দেখা যাচ্ছে, তাব নাম সেরিব্রাম। এই সেরিব্রাম আমাদের মস্তিষ্কের
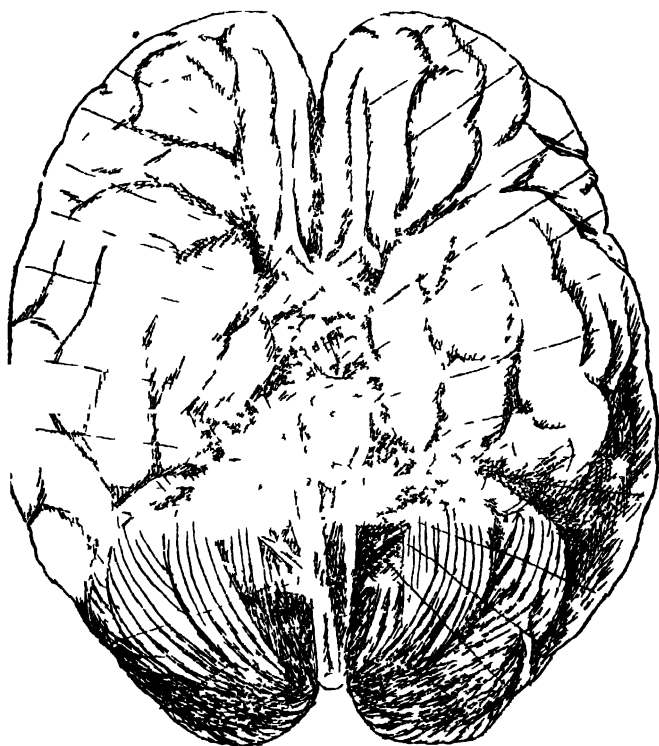
মাথাব তলাব দিকেব মস্তিষ্ক বা ঘিলু

অপর দিকটা, আর সামনেটা জুড়ে রয়েছে। প্রায দু' ইঞ্চি গভীব একটা খাদ একে ডান অংশ আর বাম অংশ—এই দু' ভাগে ভাগ কবেছে। কেমন করে তা ভাগ হযেছে, তা মাথার তলাব দিকের মস্তিষ্কের ছবি দেখলে কিছুটা আভাস পাওযা যায।

ছবির ওপরের দিকটা সেরিব্রাম, আর মাঝামাঝি তিন কোণা জায়গাটি পন্‌স্‌। তার নিচে দু' দিকে খোঁপার মতো জিনিসটি সেরিবেলাম। তার থেকে দড়ির মতো যে জিনিসটি নেমে এসেছে তার নাম মেডেলা অবলঙ্গাটা।

সেরিব্রামের চার দিকটা এক রকম ঘোলাটে রঙের পুরু পর্দা দিয়ে ঢাকা। এই পর্দা অসংখ্য স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরি। যাকে এই পর্দা ঢেকে রয়েছে, তার রঙ সাদা। এই ঘোলাটে পর্দাটা মাঝে মাঝে ভাঁজ হয়ে গেছে, যাতে ভালভাবে এর চারদিকে রক্ত যাওয়া-আসা করতে পারে। এই পর্দার ওপরেও আরো দুটো পর্দা আছে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেরিব্রামই হল আমাদের যা কিছু অনুভূতির আস্তানা। মস্তিষ্কের এক একটি অংশ আমাদের এক একটি ইন্দ্রিয়কে চালায়। যেমন, আমাদের মস্তিষ্কের পিছনের দিকের দু' ইঞ্চি নজর রাখে আমাদের চোখ ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, অন্য দু' ইঞ্চি দেখে আমাদের কান ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, আবার একটি দু' ইঞ্চি অংশ দেখে আমাদের নাক ঠিক মতো কাজ করছে কি-না। মস্তিষ্কের এই অংশগুলোর কোনোটিতে চোট লাগলে, সেই অংশটি যে ইন্দ্রিয় চালাচ্ছিলো তার ক্ষতি হয়।

ছবিতে মস্তিষ্কের দুটো ভাগ দেখানো হয়েছে। একটা মজার কথা এই যে, মস্তিষ্কের এই দুই ভাগের সঙ্গে আমাদের শরীরের ডান আর বাঁ দিকের এক রকম উলটো সম্বন্ধ। আমাদের

শরীরের ডান দিকের যা কিছু খবর সব গিয়ে পৌঁছয় মস্তিষ্কের বাঁ দিকের অংশে। ঠিক তেমনি, মস্তিষ্কের ডান দিক খেয়াল রাখে, আমাদের শরীরের বাঁ দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে। কোনো লোকের শরীরের একদিকে পক্ষাঘাত হলে বুঝতে হবে তার মস্তিষ্কের অন্য দিকে আঘাত লেগেছে। সেরিব্রাম সারা মস্তিষ্কের প্রায় দশ ভাগের নয় ভাগ জুড়ে থাকে। মস্তিকের যে দু'টি ছবি দেওয়া হয়েছে, তাতে সেরিব্রামের নিচে একটি অংশ দেখা যায়। প্রথম ছবিতে একে একটা ফুলের মতো দেখাচ্ছে, আর দ্বিতীয় ছবিতে মনে হচ্ছে যেন ঠিক মাথার পিছনে একটা খোঁপা। এই জিনিসটির নাম **সেরিবেলাম**। এর আসল কাজ হল দেহের ভার-সাম্য বজায় রাখা। জীব জানোয়ারের শরীরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেরিবেলাম যদি নষ্ট হয়ে যায়, তারা ঠিকমতো চলতে ফিরতে পারে না। মানুষেরও ঠিক তেমনি হাত-পা-কাঁপা, টলে পড়া—এইসব লক্ষণ দেখা দেয়।

সেরিবেলাম-এর পিছনে আর তলার দিকে, মস্তিষ্কের ডাইনে-বাঁয়ে দু'টি অংশের সঙ্গে যোগ রাখে কতকগুলো সুতো মিলিয়ে একটা চওড়া ফিতের মতো জিনিস। এই ফিতেকে বলে **পন্স**। আরো একটি অংশের নাম আর কাজ জানলে মোটামুটি আমাদের মস্তিষ্ক কি দিয়ে তৈরি তা বোঝা যাবে। এই জিনিসটিকে ইংরেজীতে বলে **মেডালা অবলঙ্গাটা**। এটি খুব দরকারী অঙ্গ। মস্তিষ্কের দ্বিতীয় ছবিতে যে খোঁপার মতো দেখতে সেরিবেলাম-এর কথা হল, তারও মাঝখানে যে লম্বা মতো জিনিসটি দেখা

যাচ্ছে, তাকেই মেডালা অবলঙ্গাটা বলে। এক ইঞ্চি লম্বা এই জিনিসটি আমাদের মস্তিষ্কের-সঙ্গে মেরুমজ্জার যোগাযোগ বজায় রাখছে। এতে যদি খুব সামান্য আঘাতও লাগে, সারা দেহে পক্ষাঘাত হতে পারে। মেডালা অবলঙ্গাটা নষ্ট হওয়া-মানেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। এই অংশটি আমাদের খাবার গেলা, আর নিঃশ্বাস নেওয়ার দেখাশোনা করে। এর মধ্যে ঢুকেই স্নায়ুর দুই দল উল্‌টো-পথে রওনা দেয়, যার দরুন আমাদের শরীরের ডান দিককে মস্তিষ্কের বাঁ দিক, আর শরীরেব বাঁ দিককে মস্তিষ্কের ডান দিক চালায়।

বারো

মেরুমজ্জা

মস্তিষ্ক আর মেরুমজ্জার স্নায়ু নিয়ে হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুর দল। আগেই একথা বলা হয়েছে।

আমাদের মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে আঠারো ইঞ্চি লম্বা, স্নায়ু-কোষদিয়ে তৈরি, একটা ক'ড়ে আঙুলের মতো মোটা জিনিসটির নাম—**মেরুমজ্জা**। মেডালা অবলঙ্গাটা থেকে মেরুমজ্জা বা স্নায়ুমণ্ডলী বেরিয়েছে আর নেমে গেছে—কোমরের নিচের দিকটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই পর্যন্ত। তার মাঝখান দিয়ে আঠারো ইঞ্চি লম্বা-মেরুমজ্জা চারদিকে তার স্নায়ুব শাখা-প্রশাখা ছড়াতে

ছড়াতে এসেছে। ডান আর বাঁ দিকে এমন একত্রিশজোড়া শাখা-প্রশাখা আছে। তাই এদের বলা হয় মেরুমজ্জার স্নায়ু। এদের গায়ে আবার দু'রকম স্নায়ু আছেঃ যারা খবর যোগাড় করে দেয় পেশী আর চামড়ার কাছ থেকে, আর যারা সেই পেশী আর চামড়ার কাছে খবর বয়ে দেয়।

কথাটা একটু ধোঁয়াটে রয়ে গেল, তাই না? আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে— কেমন করে এই খবর যাওয়া-আসার কাজটা হয়। আগুনে হাত পুড়ে গেলেই আমরা চেঁচিয়ে উঠি, আর হাত সরিয়ে নিই। এটা আমরা করি, কারণ আমাদের আঙুলের ডগা পর্যন্ত সেই স্নায়ুর সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে। তারা আগুনের ছোঁয়া পেয়ে চমকে ওঠে। সেই চম্‌কানির খবর তখনই স্নায়ু বেয়ে মেরুমজ্জায় পৌঁছে যায়। সেখান থেকে পালটা জবাব অন্য এক স্নায়ুবেয়ে পুড়ে যাওয়া আঙুলের পেশীতে এসে পৌঁছোয়। তখনই পেশীটি কুঁচকে যায়, আমাদের হাতও চট করে সরে আসে। এ ধরনের ব্যাপারে কোনো বুদ্ধির দরকার হয় না। তাই একে বলে **প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া**, ইংরেজীতে **রিফ্লেক্‌স্‌ অ্যাক্‌সন**।

এই প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া মস্তিষ্কের চালনায় হয় না। মানুষ ঘুমিয়েই থাক, আর জেগেই থাক, সব সময়ই এটা হতে পারে। যেমন, পায়ের নিচে সুড়সুড়ি দিলে পদতল সঙ্কুচিত হয়, চোখে বালি পড়লে চোখ বন্ধ হয়, ভাল খাবার দেখলে মুখে লালা আসে। আগুনে হাত পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটিও ঠিক তাই।

তবে আগুনে হাত পুড়লে আমাদের ব্যথা লাগে। এই

স্নায়ুমণ্ডলী
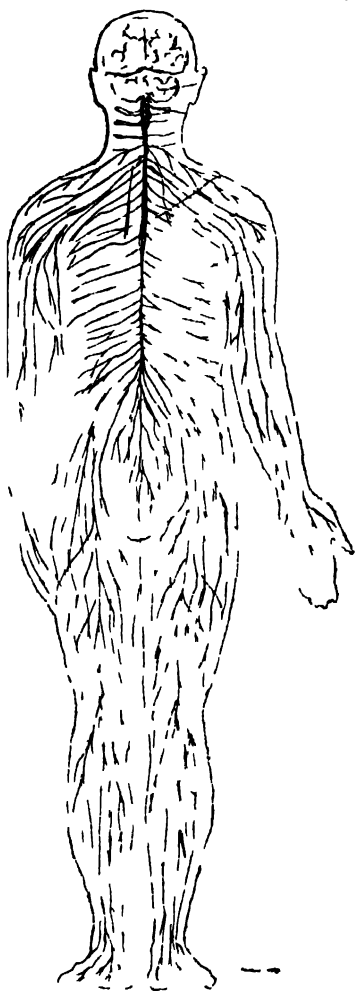
ব্যথা লাগার মানে, পুড়ে যাবার খবর মেরুমজ্জার ভিতব দিযে স্নায়ুপথে মস্তিষ্কের সেই অংশে পৌছেছে যেখানে ব্যথার অনুভূতি হয়।

যেমনি সেই খবর পৌছলো, অমনি হুকুম হল 'হাত সরিয়ে নেও।' কিন্তু সেই হুকুম মেরুমজ্জা থেকে আগেই এসে গেছে। তাই বলে মস্তিষ্কের কাজ ফুরিয়ে যায় নি। সে তখন অন্য অনেক খবর পাঠাতে থাকে, আর অন্য অনেক পেশীকে কাজে লাগাতে থাকে। যেমন, পুড়ে গেলে চিৎকাব করে ওঠা; কিংবা সাহায্য চাওয়া, দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া; এই কাজগুলো আমাদের মস্তিষ্ক করতে বলে ব'লে আমরা করি।

কেন্দ্রীয স্নায়ুমণ্ডলীর কথা হল। স্নায়ুপ্রণালীর অন্য যে

অংশ, যাকে বলে সমবেদক স্নায়ুপ্রণালী বা ইংরেজীতে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, তারা আমাদের অনৈচ্ছিক পেশীদের চালায়। এই স্নায়ুমণ্ডলীর বিষয় নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে। এরা আমাদের ইচ্ছা শক্তির বাইরে হলেও, আমাদের মানসিক অনুভূতির কিছু যোগাযোগ আছে এদের সঙ্গে।

তেরো

পরিবেশ

আমাদের দেহ যন্ত্রের কাজ কি ভাবে চলছে তা বলা হল। এখন এই দেহকে ঠিক ভাবে চালাতে হলে আমাদেরও তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

কি করে আমরা এই সহযোগিতা করতে পারি ?

সহযোগিতা করতে হলে প্রথমেই আমাদের পরিবেশটিকে সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে হবে। যে সব বাইরের জিনিস ও অবস্থা দ্বারা আমরা জন্মাবার পর থেকে সব সময় বেঁচে থাকবার জন্যে পরিবেষ্টিত হয়ে পুষ্ট ও বর্ধিত হই, তাই হল আমাদের পরিবেশ ; যেমন, বসত-বাড়ি, রোদ, জল, বাতাস, খাদ্য প্রভৃতি।

বসত-বাড়ি

সুস্থ থাকতে হলে বাড়ির পরিবেশটি আগে ভাল হওয়া চাই। বাড়ির সেই পরিবেশকেই সুস্থ পরিবেশ বলা যায়—যে পরিবেশ

মানুষের দেহ ও মনকে সুস্থ ও সতেজ রাখে। এই বকম পরিবেশ পেতে হলে বাড়ির অবস্থান, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতিব ওপর যথাযথ নজর রাখতে হয়।

বাড়ি তৈরি করতে হলে সেই জায়গার জমির সম্বন্ধে আগে জানতে হয়। মাটিতে অনেক রকম পচা জিনিস থাকে। বৃষ্টি হলে ঐসব দূষিত জিনিস্ পচে যায়। ফলে ঐসব জিনিসের কতক অংশ জলে মিশে মাটির নিচে চলে যায়, কতক পুকুর বা অন্য কোনো জলাশয়ে যায়. আর বাদ-বাকি জমির ওপরই ছড়িয়ে থাকে। এইসব পচা জিনিস থেকে একরকম দূষিত 'গ্যাসের' সৃষ্টি হয়। সেই গ্যাস বাতাসের সঙ্গে আমাদের নাকে এসে ঢোকে। তাতে আমাদের ক্ষতি হয়। এইজন্যে আবর্জনা দ্বারা ভরাট জমি, বা এঁদো পুকুব প্রভৃতিব কাছে বাড়ি করতে নেই।

রোদ

সৃষ্টির অপূব মহিমা আমাদের এই সূর্য। শরীরেব ওপব সূর্যকিরণের প্রভাব খুব বেশি।

সূর্যের কিবণ তিন ভাগে বিভক্ত—(১) আলোক রশ্মি, (২) উত্তাপদায়ক রশ্মি, (৩) স্বাস্থ্যপ্রদ রশ্মি।

সূর্যের আলোক রশ্মির সঙ্গে আছে আমাদের মনের নিগূঢ় সম্বন্ধ। এই রশ্মি শরীবের জড়তা দূর করে এবং কাজে উৎসাহ দেয়। যতদিন সূর্য মেঘে ঢাকা থাকে, ততদিন শরীর ভাল থাকে না, ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে, আর কোনো কাজে উৎসাহও পাওয়া যায় না।

আকাশ থেকে মেঘ সরে গেলে সূর্যের আলোক পেয়ে আমরা যেন নতুন জীবন পাই।

সূর্যের উত্তাপদায়ক রশ্মিও আমাদের নানা ভাবে উপকার করে। এই রশ্মির প্রভাবে ভূমির আর্দ্রতা যায় কমে, আর পচা ও গলা জিনিসগুলো ক্রমে শুকিয়ে দুর্গন্ধও যায় দূর হয়ে। প্রখর রৌদ্র-তাপে টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি রোগের বীজাণুও যায় নষ্ট হয়ে।

জল

জল আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ দরকার। আমাদের শরীরে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জল। খাবার থেকে আমরা যে পরিমাণ জল পাই, তা আমাদের শরীরের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ মল, মূত্র, ঘর্ম প্রভৃতি নানা আকারে আমাদের শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়। সেই জন্যে সারাদিনের মধ্যে আলাদা-ভাবে জল পান করে আমাদের সেই ক্ষতিপূরণ করতে হয়।

এই জল আমাদের রক্তকে তরল অবস্থায় রেখে দেহের সব জায়গায় তার চলাচলের সাহায্য করে। জল আমাদের খাদ্যকে কোমল ও তরল ক'রে পরিপাকের সহায়তা করে, আর রক্তের সঙ্গে মিশে যাওয়ার উপযোগী করে তোলে। তাছাড়া অজীর্ণ খাদ্য ও শরীরের দূষিত পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে মল, মূত্র ও ঘর্মের আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রায় পাঁচ পাঁইট জল শরীর থেকে ফুসফুস, চর্ম প্রভৃতি দ্বারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে

নির্গত হয়। প্রতিদিন অন্ততঃ আড়াই সের বিশুদ্ধ জল প্রত্যেকের পান করা উচিত।

বাতাস

বাতাস আমাদের প্রাণ। না খেয়ে মানুষ কিছুকাল বাঁচতে পারে; কিন্তু বাতাস না হলে আমাদের একদণ্ডও চলে না। বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে মানুষের স্বাস্থ্য অটুট থাকে, কর্মক্ষমতা বাড়ে, আর জীবন যাত্রা আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে।
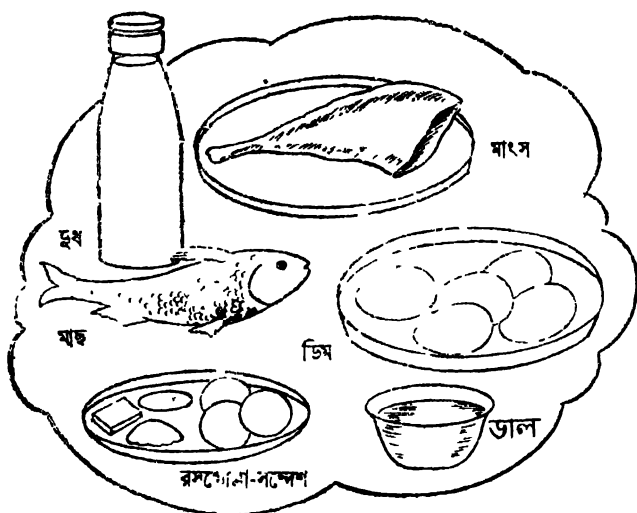
ছানাজাতীয় খাদ্য

খাদ্য

আমরা যা কিছু খাই, তার সবগুলোকেই খাদ্য বলা চলেনা। যে সব দ্রব্য আহার করলে আমাদের শরীরের ক্ষয়পূরণ,

স্নেহ জাতীয় খাদ্য
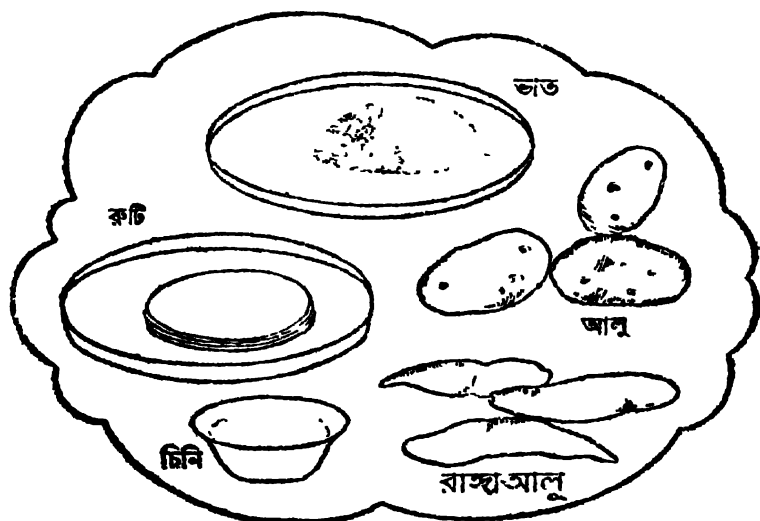
শর্করা জাতীয় খাদ্য

পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন ও তাপ ও শক্তি উৎপাদন এবং রোগ-প্রতিরোধক শক্তি বাড়ে সেইগুলোই আমাদের প্রকৃত খাদ্য। সেই জন্যে আমাদের দেহ-পরিপোষক খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

ছানাজাতীয়, স্নেহজাতীয়, শর্করা জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ যে-সব খাদ্য গ্রহণ করলে সব দিক দিয়ে উপকার হয়, সেইগুলোই আমাদের দেহ-পরিপোষক খাদ্য।

এইভাবে সব দিকে ঠিক ভাবে ব্যবস্থা করে অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই হল সুপরিবেশে বাস করা।

চোদ্দ

গ্রাম

আমরা যে সভ্যতার গর্ব করি তার জন্ম গ্রামে। আমাদের যে সমাজ তা গড়ে ওঠে গ্রাম থেকেই। ছোট-বড়ো অনেক শহর, আর হাজার হাজার গাঁ নিয়ে গড়ে ওঠে একটি দেশ। এই দেশ কি রকম উন্নতি করেছে, তা জানা যায় সে দেশের গ্রামগুলো কেমন উন্নত এবং স্বাস্থ্যে ভরপুর সেদিকে নজর করলে। তাই গাঁয়ের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে দেশের পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য।

শহর পরিষ্কার করবার জন্যে আলাদা লোক আছে। গাঁয়ে তা নেই। কাজেই সব লোক এক হয়ে নিজ নিজ গ্রাম পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা উচিত।

পরিবার প্রথা থেকে গড়ে উঠেছে পাড়া, গ্রাম। হাজার হাজার গ্রামের গঠন এই ভাবেই হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষ নিজেদের দরকারে গাঁয়ের পত্তন করেছিলো,—যেখানে উর্বর জমির আশ-পাশে জলের প্রাচুর্য আছে।

আমাদের পশ্চিম বাঙলায় এখন আটত্রিশ হাজারেরও কিছু বেশী গ্রাম, আর শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামেই বাস করে। গ্রামের গুরুত্ব কতখানি এ থেকে সহজেই তা বোঝা যায়।

অনেক সময় গ্রামবাসীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নির্দেশকে অবহেলা করে। বাড়ি-ঘরের আবর্জনা রাস্তা-ঘাটে ফেলে, রাস্তার এক পাশে গিয়ে মলত্যাগ করে, এবং এই রকম আরো কত কি নোংরা কাজ করে।

এই সব অভ্যাস বদলাতে হবে। তাহলে গাঁয়ের পরিবেশ উঠবে সুন্দর হয়ে আর সেই আদর্শ গাঁয়ে বাস করে আমরাও অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে থাকতে পারবো।

পনেরো

স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা

একটি রুগ্ন জাতির চেয়ে একটি সুস্থ জাতির পক্ষে আর্থিক উন্নতি করা সহজ। অর্থ ও স্বাস্থ্য—দুটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

স্বাস্থ্য ঠিক না রাখতে পারলে শরীর যায় দুর্বল হয়ে। আর দুর্বল শরীরে সহজেই রোগ ধরে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ রোগের কোনো না কোনো রকম জীবাণু আছে।

দেহের মধ্যে এই সব জীবাণু ঢোকা মাত্রই রোগ দেখা দেয় না। দু'রকম কণিকা আছে আমাদের দেহে—লাল কণিকা ও সাদা কণিকা। দেহের মধ্যে রোগের জীবাণু ঢুকলে সাদা কণিকাগুলো তাদের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে। অনেক সময় জীবাণু হেরে যায়। তাই রোগে ধরতে পারে না। কিন্তু যদি না হারে তবেই রোগ প্রকাশ পায়।

কিভাবে রোগ ছড়ায়

১। জলে, স্থলে, আর শূন্যে রোগ-বীজাণু ছড়ানো রয়েছে। অসাবধান হলেই মানুষের দেহের ওপর তারা ছোবল মারে।

২। ধুলো-বালির সাহায্যে যক্ষা, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের জীবাণু সুস্থ লোকের দেহে যায়।

৩। পিঁপড়ে, আরশুলা, উইচিংড়ে প্রভৃতি কীট পতঙ্গেরা খুব নোংরা জায়গায় থাকে। তাদের দেহে ও পায়ে প্রায়ই রোগ-জীবাণু লেগে থাকে। সে অবস্থায় তারা খাদ্যের ওপর বসলে বা পানীয়ের মধ্যে পড়লে খাদ্য ও পানীয় দূষিত হয়। এই দূষিত খাদ্য ও পানীয় খেয়ে অনেক লোক রোগে পড়ে।

৪। ম্যালেরিয়া রোগে ভুগছে এমন রোগীকে কামড়ে এনোফিলিস জাতের স্ত্রী-মশা সুস্থ লোককে কামড়ায়। এতে সুস্থ লোকটির ম্যালেরিয়া হয়। কিউলেক্স জাতের মশার কামড়ে ফাইলেরিয়া বা বাত শিরার জ্বর হয়। স্যাণ্ডফ্লাই

মাছি কামড়ালে কালাজ্বর হতে পারে। ইঁদুরের দাঁতে এক রকম জীবাণু থাকে। ইঁদুর কামড়ালে "র‍্যাট-বাইট ফিভার" হতে পারে। অনেক সময় "টিউবার্‌কল্" নামক জীবাণু গোরুর ফুসফুসে ও স্তনে থাকে। সেই গোরুর দুধপান করলে মানুষের রোগে ধরতে পারে। ঘোড়ার সর্দি থেকে 'গ্ল্যাণ্ডাস' নামে একরকম রোগ অনেক সময় মানুষকে ধরে।

৫। পানীয় জল আর মাছি থেকে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। এজন্যে সাবধান হতে হয়, আর বিশুদ্ধ জল সব সময়েই পানের জন্য ব্যবহার করতে হয়।

৬। খোস, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি খুব ছোঁয়াচে রোগ। বাড়ির একজনের এরকম কোনো রোগ হলে, অনেক সময় অন্যেরাও রেহাই পায়না। অনেক বাড়িতে রোগীর কাপড়, গামছা, বিছানা প্রভৃতি আলাদা রাখা হয়না। কাপড়, গামছা আলাদা থাকলেও একই বিছানায় অনেকে রোগীর সঙ্গে শোয়। কাজেই এসব অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হয়।

৭। ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত লোকে যখন খুব জোরে কথা বলে, হাঁচে বা কাশে, তখন তাদের নাক ও মুখ থেকে রোগ-জীবাণু বের হয়। এ সব জীবাণু আমরা না দেখতে পেলেও কোনো সুস্থ লোক যদি এই সব রোগীর কাছে থাকে তবে রোগ জীবাণু তার নাক দিয়ে বুকে চলে যায়। তখন সেই সুস্থ লোকের রোগে ধরতে আর দেরী থাকে না।

৮। যানবাহনের সাহায্যে যাতায়াত যত সহজ হয়ে উঠছে, রোগের বিস্তারও তত বাড়ছে। কাজের খাতিরে রোজ যানবাহনের সাহায্যে যাতায়াত করতে হয়। ফলে নিজেদের রোগ পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হয়। চা-খাবার দোকান বা হোটেল থেকেও অনেকে রোগ জুটিয়ে নিয়ে আসে। একই কাপডিসে খেয়ে রোগগ্রস্ত লোকেরা নিজ নিজ রোগের ঐ সব পাত্রে ছোঁয়া রেখে খায়।

শরীরের দিকে নজর রাখতে আমাদের যা করা দরকার তা খুব সাধারণভাবে কয়েক কথায় বললাম। তবে মরণকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তাই ব'লে নিজের দোষে রোগে ভুগে অকালমৃত্যু বরণ করাও খুব দুঃখের। শরীরের মধ্যে কোথায় কি আছে, আর তাদের কার কি কাজ তা বলা হয়েছে। এখন সেই শরীরকে ঠিকভাবে চালাতে হলে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম মেনে চলতে হবে। স্বাস্থ্যই তো মানুষের সম্পদ। প্রচুর অর্থ আর ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও স্বাস্থ্যের অভাবে মানুষ নিজেকে অসুখী মনে করতে পারে। তাই জাতির আশা-ভরসা ভেবে দেহকে মজবুত রাখতে হবে, নইলে প্রাণের প্রাচুর্য যাবে নষ্ট হয়ে, আর বেঁচে থেকেও মানুষ মরার সামিল হয়ে পড়বে।